سوانح کربلا

সাওয়ানিহে কারবালা

মূল ঃ সদরুল আফাদ্বিল আল্লামা
সৈয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদক
সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী আশরাফী

সাওয়ানিহে কারবালা

(কারবালার ঘটনা সমূহ)

মূলঃ
সদরুল আফাযিল, আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী
আশরাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
ইউপি, ভারত।

অনুবাদঃ
সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী আশরাফী
সাজ্জাদানশীনঃ রাহাতিয়া বিসমিল্লাহ শাহ দরবার শরীফ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
আরবী প্রভাষকঃ জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা।
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। ফোন- ০১৮১৫-৬০২১৭৬

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনায়ঃ
আল্লামা মুফতি কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ (মঃজিঃআঃ)
ফকীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
খতিব, হযরত শাহ মোহছেন আউলিয়া (রাহ.) শাহী জামে মসজিদ, আনোয়ারা

প্রকাশনায়ঃ
জাগরণ প্রকাশনী, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অলঙ্করণেঃ
এম এম মামুনুর রশীদ
আল হারুনী কম্পিউটার

প্রকাশকালঃ
১০ মহররম ১৪৩৯ হিজরী, ১ অক্টোবর ২০১৭ইংরেজী

স্বত্বঃ অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তি স্থানঃ
দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহ।

মূল্যঃ
১৬০/- (একশত ষাট টাকা মাত্র)

অনুবাদকের এ ক্ষুদ্র খিদমাত

❖গাউসুল আযম শাহসূফী সৈয়্যদ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কুদ্দিছা ছিররুহুল আযিয
❖ আ'লা হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন মিয়া আশরাফী জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান ফাযেলে বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖ বাহরুল উলুম আল্লামা সৈয়্যদ রাহাতুল্লাহ নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖কুতুবুল আউলিয়া হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ ছিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক্ব শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖গাউসে যমান আওলাদে রাসূল সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖ শায়খুল হাদীস আল্লামা সৈয়্যদ নুরুচ্ছাফা নঈমী আশরাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖ অলীয়ে কামিল শাহসূফী সৈয়্যদ বিসমিল্লাহ শাহ নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
❖শায়খুল হাদীস আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ হালিমুদ্দীন আশরাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র পবিত্র শানে ....

উৎসর্গিত।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تقریظ

شیر ملت مفتی اہل سنت صاحب عز وجلال معدن فیض وکمال علامہ مفتی محمد عبید الحق نعیمی قادری مدظلہ العالی
شیخ الحدیث جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ 'شیتا غونغ' بنگلہ دیش

حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمہ والرضوان نے اردو میں جو "سوانح کربلا" پرخامہ فرسائی کی واقعی قابل دید ہے. خوارج وروافض کی موضوع روایات کو خاتمہ کردیا اور کربلا کی صحیح روایات کو قلمبند فرمایا. آپکی اردو زبان بہت فصیح ہیں. حتی کہ ایک زمانہ نہیں بلکہ اب تک آپکو بابائے اردو سے سنی مسلماں یاد کرتے ہیں. آپ مختلف فنون کے امام تھے. معقولات ومنقولات میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے. آپ بہت بڑے صاحب تصانیف تھے اور اہل سنت والجماعت کے پیشوا بھی تھے اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی تھے. آپکی تصانیف مبارکہ میں سے اردو زباں میں لکھا گیا ایک رسالہ سوانح کربلا جس میں آپ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں فضائل مدینہ منورہ وفضائل جوار مصطفیٰ اور حسنین کریمین کی فضائل وکمالات کو احادیث صحیحہ سے ثابت کیا. یزید نامراد کی کرتوت، امام عالی مقام کی شہادت نیز اہل بیت کی شہادت کی اَن منت واقعات کو صبح قیامت تک اہل سنت کیلئے ایک درس عبرت چھوڑا جسکو بنگالی زبان میں عزیز گرامی سید محمد ابو نوشاد نعیمی سلمہ نے بہت نفیس پرایہ میں بنگلہ ترجمہ کرکے بنگلہ دیش کے سنی مسلمانوں پر احسان عظیم کیا. اللہ تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عزیزم کو جزاء خیر عطا فرمائے.

آمین.

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস, শেরে মিল্লাত, মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা শাহসুফী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব কিবলা (মু.জি.আ.)'র বাণীর বঙ্গানুবাদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম- আম্মা বা'দ
হযরত সদরুল আফাদ্বিল, ফখরুল আমাসিল হাকীম সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (আলাইহির রাহমাহ ওয়ার রিদ্বওয়ান) উর্দু ভাষায় 'সাওয়ানিহে কারবালা' নামক কিতাবে যা লিখেছেন, বাস্তবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। তার এ রচনা খারেজী, রাফেজীদের বানাওয়াট বর্ণনাগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে তিনি কারাবালা ঘটনা সমূহকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার উর্দু ভাষা বিশুদ্ধ, খাঁটি ও বাচনভঙ্গি বিশিষ্ট। এ সুস্পষ্টতা কেবল এক যমানায় সীমাবদ্ধ নয় বরং আজো তাকে 'বাবায়ে উর্দু' বা উর্দু ভাষার পিতা হিসেবে সুন্নী মুসলমানরা স্বরণ করে থাকে। হযরত সদরুল আফাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন বহুবিধ বিষয়ের উপর পান্ডিত্য অর্জনকারী ইমাম। আকলী ও নকলী দলিল উত্থাপনে তিনি অসম্ভব যোগ্যতা রাখতেন। তিনি ছিলেন উচুঁ মাপের বহু গ্রন্থ প্রণেতা। এছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একজন পেশওয়া ছিলেন। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফাও বটেন। তার রাচিত অসংখ্য গ্রন্থ থেকে উর্দু ভাষায় লিখিত একটি পুস্তিকা হলো 'সাওয়ানিহে কারবালা' যেখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিবেশী এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মর্যাদা ও পূর্ণতাকে বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট ইয়াযিদের দুশ্চরিত্র, ইমাম আলী মকামের শাহাদাত এমনকি আহলে বাইতের শাহাদাতের নিদারুন আত্মত্যাগের সমূহ ঘটনা কিয়ামত পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের জন্য এ পুস্তিকা যেন শিক্ষনীয় পাথেয়। যে বইটি বাংলা ভাষায় আমার স্নেহের সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী (মহান আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন) অত্যন্ত সাবলীল ও উত্তমভাবে অনুবাদ করে বাংলাদেশী সুন্নী মুসলমানদের উপর বড় ইহসান করেছেন। মহান আল্লাহ হুযুর কারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাদক্বায় আমার স্নেহভাজন (সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু নাওশাদ নঈমী) কে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমীন।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী (মঃজিঃআঃ) এর

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম- আম্মা বা'দ

কারবালা একটি চেতনার নাম। হক্ব ও বাতিলের চিরদ্বন্দ্বে সত্য-ন্যায়ের পথে অনড় থাকবার প্রকৃত আদর্শের ইতিহাস হলো কারবালা। ৬১ হিজরী সনের ১০ মুহার্‌রম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কলিজার টুকরা প্রিয় দৌহিত্র ইমাম আলী মকামের শাহাদাতের মাপকাঠিতেই মুলত ইসলামের মুলধারা নির্ণয় করা হয়। কারবালা, আহলে বাইত এবং খুলাফায়ে রাশেদার আত্মত্যাগ, অবদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সদরুল আফাযিল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রচিত "সাওয়ানিহে কারবালা" প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানীদের জন্য উৎকৃষ্ট দলিলও বটে। নিখুঁত পন্থায় লিখিত এ কিতাব খানা জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসার আরবী প্রভাষক, রাংগুনীয়া রাহাতিয়া দরবার শরীফের শাহযাদা স্নেহের মাওলানা সৈয়্যদ আবু নওশাদ নঈমী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশনা জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া উর্দু ও ফার্সী ভাষার কবিতাগুলো বাংলা কাব্যানুবাদ করে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে ইতিবাচক অবদানও রেখেছে। আমি অনূদিত "সাওয়ানিহে কারবালার" বহুল প্রচার ও অনুবাদকের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী (মঃজিঃআঃ)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার ফকিহ্ ওস্তাযুল ওলামা, বদরুল ফুযালা, ফকিহে মিল্লাত আল্লামা কাযী মুফতি আব্দুল ওয়াজেদ (মঃজিঃআঃ) এর

অভিমত

হামিদাও ওয়ামুসাল্লিয়াও ওয়া মুসাল্লিমা- আম্মা বা'দ

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ভালোবাসা, সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা এবং ঐতিহাসিক কারবালায় সংঘটিত হৃদস্পর্শী নিদারুন কুরবানীর উপর সদরুল আফাযিল, ফখরুল আমাসিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী আলাইহির রাহমাহ রচিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "সাওয়ানিহে কারবালা"র বাংলা পান্ডুলিপির আদ্যন্ত আমি দেখেছি এবং যাচাই বাছাই করেছি। চমৎকার ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে আমার স্নেহের শাগরীদ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী মাযহাব মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ খিদমাত আনজাম দিয়েছে। আমি বাংলায় অনূদিত সাওয়ানিহে কারবালার বহুল প্রচার কামনা করি এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করি।

ফকিহে মিল্লাত আল্লামা কাযী মুফতি আব্দুল ওয়াজেদ (মঃজিঃআঃ)

ফকীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া।

অনুবাদকের নিবেদন

গীত-গুঞ্জনার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর দরবারে অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা। অযোগ্যতা ও সর্বাঙ্গীন সীমাবদ্ধতা সত্বেও তিনি এ অধমের মাধ্যমে “সাওয়ানিহে কারবালা” কিতাবের বাংলা অনুবাদের খিদমাত নিয়েছেন। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কদমে অজস্র দরুদ সালাম। যার পরিবারের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলাম পুনঃজীবিত হয়েছে।

মাযহাবে ইসলামই দ্বীনে হক, যার প্রচার ও প্রসারের জন্য ফিদায়ানে দ্বীনগণ কালের চাহিদানুপাতে নিজের জান-মাল, এমনকি প্রিয় সন্তান পর্যন্ত কুরবান দিয়ে আসছেন। স্বয়ং মহান নবীজি তায়েফ থেকে বদর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের তাবলীগ ও সংরক্ষণের নিমিত্তে কী পরিমান দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন কারীগণ সে সম্বন্ধে দিবালোকের ন্যায় জ্ঞাত আছেন। খুলাফায়ে রাশেদার আত্মসারতার বিসর্জন ইতিহাস ও মহানুভবতার নিগড়িত বয়ান হক্বপন্থিদের এখনো দ্বীন পরিচর্যায় উৎসাহ যোগায়। পূর্বাঞ্চলীয় এক কবির ভাষায়-

اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک + تیری رگوں میں خوں ہے رواں چار یار کا
থেমে যাবেনা স্পন্দন- হে ইসলাম তোমার হাশরতক্!
তোমারি শিরায় খোন উপশিরায় চার ইয়ারের, তুমিইতো হক্ব।

মহান এ স্বত্তা গুলো জাহেরী পর্দা করার পর ইসলাম এবং ইসলামের মূলধারায় যখন সুস্পষ্ট তামশা শুরু হয়। তার যথোচিত জবাব দেয়ার লক্ষ্যে শাহযাদায়ে রাসুল, জিগারে গুশায়ে মাওলা আলী ও বাতুল, হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ত্রানকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পিশাচ-যালিম ইয়াযিদের করাল-গ্রাসে মৃতকল্প ইসলামকে জীবন দিতে গিয়ে স্বপরিবারে শাহাদাতও বরণ করেন।

খুলাফায়ে রাশেদা ও ইমাম পাকের পরিচয় এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানের উপর আদ্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ “সাওয়ানিহে কারবালা” বইটির রচয়িতা উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, মাযহাবে আহলাফের সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার, হাযারো আলিমেদ্বীনের প্রাণপ্রিয় উস্তায,বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ভারতের উত্তর প্রদেশ-মুরাদাবাদের প্রসিদ্ধ মাদরাসা “জামেয়া নঈমীয়ার” প্রতিষ্ঠাতা, আলে রাসুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হাকিম মুফতি নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী আশরাফী রজভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমার দাদা হুযুর অলীয়ে কামিল হাফিয ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ বিসমিল্লাহ শাহ্ নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তায তিনি। সে সুবাদে খুব ছোট বেলা থেকেই সায়্যিদি সদরুল আফাযিলের পরিচয় শুনে আসছি। পর দাদা হুযুর মুজাদ্দিদে যামান শাহ সৈয়্যদ রাহাতুল্লাহ নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তার সহপাঠি। যুবদাতুল আরেফীন হযরত সৈয়্যাদ গুল মুহাম্মদ কাহেলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে উভয়েই ইলমে দ্বীন হাসিল করেন। বড় দাদা হুযুর শায়খুল হাদীস আল্লামা সৈয়্যদ নুরুচ্ছাফা নঈমী রাহমাতুল্লাহিতো হুযুর সায়্যিদি সদরুল আফযিল রাহমতুল্লাহি আলাইহিরই মুখপাত্র ছিলেন। সব সম্পকর্কে বিশ্লেষন করলে অধম কিন্তু তার দুরদৃষ্টির বাইরে নই। সম্ভবত সে কারণে “সাওয়ানিহে কারবালা” গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তরের খিদমাত আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

এ কথা প্রচলিত যে, “সাওয়ানিহে কারবালা” গ্রন্থটি কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় খুবই “মুসতানাদ” বা নির্ভরযোগ্য। লেখক বইটি রচনায় সনদের বিশুদ্ধতার উপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। বেশ কটি মিথ্যে ইতিহাসের রদ করে দিয়ে সে সবের সমাধানও দিয়েছেন। বিগলিত হৃদয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে তুলেছেন আহলে বাইতের শাহাদাতের করুন কাহিনী। যা পাঠান্তে যে কোন পাঠকের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হবে। চক্ষু হবে অবারিত অশ্রুধারায় সিক্ত। আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আহলে বায়তের কুরবানী বর্ণনা লিখতে গিয়ে বার বার অশ্রুসিক্ত হয়েছি। ভিজিয়েছি পান্ডুলিপির পাতাগুলাকে।

সব মিলে বইটি পাঠক সমাদৃত ও খুবই জনপ্রিয়। তবে তা আরবী-উর্দু ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ হওয়াই বাংলাভাষী সকলেই উপকৃত হতে পারবে। যদ্যপি এ মহান কাজটির ষোলআনা পূর্ণ করাতো দুরের কথা, আধুলিও আদায় করতে পেরেছি কিনা বোধগম্য নয়।

অনুবাদ কাজের পান্ডুলিপি যাচাই বাছাই করে চির কৃতজ্ঞ বানালেন প্রাণপ্রিয় শিক্ষাগুরু, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শাইখুল হাদীস, শেরে মিল্লাত, আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (ম:জি:আ) সাহিব কিবলা। এছাড়া নিরীক্ষণ কাজে মুল্যবান সময় দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন প্রিয় উস্তায, জামেয়ারই ফকীহ্, মুফতিয়ে আযম আল্লামা কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ সাহেব কিবলা (ম:জি:আ:)। মূল্যবান বাণী দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন আরেক প্রিয় উস্তায জামেয়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ সোলাইমান আনসারী (ম:জি:আ:) আল্লাহ পাক সমুহ হযরতকে দু'জাহানে সমুজ্জল করুন। (আমিন)

সাওয়ানিহে কারবালা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে জাগরণ প্রকাশনীর সত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম ভাই আমাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিলেন। তজ্জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বিবিধ সহযোগিতার জন্য তরুণ আলিমেদ্বীন মাওলানা সৈয়দ শিহাবুদ্দীন মাসরুফ কাদেরীর শুকরিয়া আদায় করছি।

সর্বোপরি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণ কাজে ত্রুটি হতে পারে, ভুল থাকতে পারে বিভিন্নভাবে। দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র সরাসরি অথবা টেলিফোনে /চিঠির মাধ্যমে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হব। সাওয়ানিহে কারবালার বহুল প্রচার, ভবিষ্যৎ প্রকাশনায় আপনাদের সহযোগিতা ও হৃদ্যতা কামনা করছি।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী আশরাফী
রাহাত্তিয়া দরবার শরীফ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

১. মুল লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়/১৩
২. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ভালোবাসা ।/১৬
৩. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু/২১
৪. সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ/২৩
৫. বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণকারী/২৫
৬. আফদ্বলীয়াত/ শ্রেষ্ঠত্ব/২৫
৭. খিলাফত/২৭
৮. সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের কিছু ঘটনা/২৯
৯. যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি/৩১
১০. ইয়ামার যুদ্ধ/৩২
১১. কুরআন সংকলণ/৩৩
১২. ওফাত/ ইন্তিকাল/৩৩
১৩. দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৩৪
১৪. ইসলামে দীক্ষিত হবার কারণ/৩৫
১৫. ইসলাম গ্রহণকালের ঘটনা/৩৫
১৬. আসমানবাসীদের উল্লাস/৩৭
১৭. ফদ্বীলত / মর্যাদা/৩৮
১৮. হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত/৩৮
১৯. হযরত ওমরের তপস্যা, খোদাভীতি, বিনয় ও সহনশীলতা/৪১
২০. খিলাফত/৪৩
২১. শাহাদাত/৪৪
২২. তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৪৫
২৩. হযরত ওসমানের ইসতিক্বামাত/৪৬
২৪. ফদ্বীলত/ মর্যাদা/৪৬
২৫. খিলাফত/৪৭
২৬. রাজ্য বিস্তার ও বহুমুখী উন্নয়ন/৪৮
২৭. দস্তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি তা'যীম/৪৯
২৮. শাহাদাত/৪৯
২৯. শত্রুদের পরিণাম/৪৯
৩০. ফিতনার আবির্ভাব/৪৯
৩১. চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (কাররামাহুল্লাহু ওয়াজহুহু)/৫১
৩২. আবু তুরাবে তৃপ্ত আলী/৫২
৩৩. ফদ্বীলত/মর্যাদা/৫২
৩৪. বায়আত ও শাহাদাত/৫৫
৩৫. আহলে বায়তে নবুয়্যাত/৫৭
৩৬. ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা/৬৭
৩৭. হাসান নামকরণ ও নবীজীর মুহাব্বাত/৬৭
৩৮. মানাক্বিব /গুণাবলী/৬৯
৩৯. সহনশীলতা/৬৯
৪০. খিলাফত/৬৯
৪১. শাহাদাত/৭১
৪২. লক্ষণীয়-প্রচলিত মিথ্যার অবসান/৭৩
৪৩. কারবালা প্রান্তরে রক্তাক্ত দৃশ্যের অবতারণা/৭৫
৪৪. হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার সফরসঙ্গীদের বে-নযীর জানবাযী/৭৫
৪৫. শুভাগমন/৭৫
৪৬. বিস্ময়কার স্বপ্ন/৭৬
৪৭. শাহাদাতের জনশ্রুতি/৭৬
৪৮. হাদীসে পাকে শাহাদাতের সংবাদ/৭৯
৪৯. শাহাদাতের ঘটনাসমূহ- নাপাক ইয়াযিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা/৮১
৫০. আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত এবং ইয়াযিদের সালতানাত/৮২
৫১. ইমামে পাকের মদীনায় রওয়ানা/৮৪
৫২. ইমামের কাছে কুফাবাসীর দরখাস্ত/৮৪
৫৩. হযরত মুসলিমের কুফা রওয়ানা/৮৬
৫৪. ইয়াযিদকে সংবাদ জ্ঞাপন/৮৭
৫৫. ইবনে যিয়াদকে গর্ভণর নিয়োগ ও তার প্রতারনা/৮৭
৫৬. ইবনে যিয়াদের ঘোষণা/৮৮
৫৭. হযরত মুসলিমের হানীর ঘরে অবস্থান ও হানীর গেস্খতার/৮৮
৫৮. ইমাম মুসলিম কর্তৃক গর্ভণর হাউস ঘেরাও/৮৮
৫৯. ইবনে যিয়াদের অপকৌশল বাস্তবায়ন হলো/৮৯
৬০. হযরত মুসলিমের শাহাদাত/৯০
৬১. হযরত মুসলিম পুত্রদ্বয় ও হানীর শাহাদাত/৯১
৬২. পাদটীকা-১/৯১
৬৩. ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফা অভিমুখে/৯৩
৬৪. বশির ইবনে গালিব'র সাক্ষাত/৯৪
৬৫. ওবাইদুল্লাহ ইবনে মুতি'র সাক্ষাত/৯৫
৬৬. কুফাবাসীর ওয়াদাভঙ্গ ও হযরত মুসলিমের শাহাদাত/৯৫
৬৭. হুর বিন ইয়াযিদের সঙ্গে সাক্ষাত/৯৫
৬৮. কারবালায় অবতরণ/৯৬
৬৯. ইবনে যিয়াদের চিঠি/৯৭
৭০. আমর ইবনে সা'দের রওয়ানা/৯৮

৭১. ৬১ হিজরী ১০ মুহাররম'র হৃদয় বিদারক ঘটনা/১০০
৭২. তাক্বরীর/ভাষণ/১০১
৭৩. ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত/১০২
৭৪. একদল গ্রামবাসীর হুসাঈন প্রেমে শাহাদাত বরণ/১০৪
৭৫. নও দুলহা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহর শাহাদাত বরণ/১০৪
৭৬. হুর বিন ইয়াযিদের শাহাদাত/১০৯
৭৭. শাহাদাতের কামনায় অস্থির আহলে বাইত/১১২
৭৮. গৌরব ও বীরত্বগাঁথা যুদ্ধ/১১৩
৭৯. ইমাম আলী আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত/১১৪
৮০. তারেক ও তার পুত্রদ্বয়ের লাঞ্চনাদায়ত মৃত্যু/১১৯
৮১. মিসরা বিন গালিব'র শোচনীয় দশা/১২০
৮২. আহলে বাইতের ধৈর্য ও সহ্য/১২২
৮৩. ইমাম আলী আসগর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত/১২২
৮৪. ইমাম আলী মকাম হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত/১২৪
৮৫. হযরত যয়নুল আবেদীন ইমামে পাকের স্থলাভিষিক্ত/১২৫
৮৬. ময়দান অভিমুকে ইমামে পাক/১২৫
৮৭. সংক্ষিপ্ত ভাষণ/১২৬
৮৮. মর্মস্পশী ভাষণের প্রভাব/১২৭
৮৯. অবশেষে ইমামে পাকের যুদ্ধ/১২৮
৯০. মাথা মুবারকের দাফন/১৩২
৯১. প্রিয় দৌহিত্রের শাহাদাতে নবীজীর আর্তনাদ/১৩২
৯২. শাহাদাতের শোকে অন্ধকার দুনিয়া/১৩৩
৯৩. অলৌকিক ঘটনা সম্ভার/১৩৩
৯৪. জ্বীন সম্প্রদায়ের আহযারী/১৩৪
৯৫. দেহহীন মস্তক মুবারকে অলৌকিক আওয়াজ/১৩৪
৯৬. অলৌকিক কলম/১৩৫
৯৭. খ্রিস্টান পাদ্রীর ঈমান গ্রহণ/১৩৫
৯৮. শাহাদাত পরবর্তী ঘটনা সমূহ/১৩৭
৯৯. মক্কা ও মদীনা শরীফে ইয়াযিদ বাহিনীর তান্ডবলীলা/১৩৭
১০০. নাপাক ইয়াযিদের মৃত্যু/১৩৮
১০১. ইবনে যুবাইরের হাতে বায়আত/১৩৮
১০২. ইয়াযিদ পুত্রের খিলাফত গ্রহণ/১৩৯
১০৩. ইবনে সা'দের লাঞ্চনাদায়ক মৃত্যু ও মুখতার সাক্বাফী কর্তৃক প্রতিশোধ/১৩৯
১০৪. ইবনে যিয়াদের করুণ পরিণতি/১৪১

লেখক পরিচিতি

শুভাগমন: সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা হাফেজ হাকিম মুফতি সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী চিশতী আশরাফী কাদেরী বারাকাতী কাদ্দাসা সিররুহু ২১ সফর ১৩০০ হিজরি, ১ জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বুধবার ভারত উত্তর প্রদেশস্থ মুরাদাবাদ শহরে সম্রান্ত সৈয়্যদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

নাম ও বংশ পরিচয়: ইলমুল আবজাদে তার জন্ম সনের হিসাব অনুযায়ী নাম হয়- "গুলামে মুস্তফা"। জন্মের পর মুহতারাম পিতা তার নাম রাখেন- নঈমুদ্দিন। অসামান্য জ্ঞান ও পান্ডিত্যের কারণে যুগের মুকতাদার উলামায়ে কেরাম তাঁকে "সদরুল আফাযিল" উপাধিতে অভিষিক্ত করেন। সুন্নি দুনিয়ায় এ অভিধায় তিনি একক ও অনন্য। অন্য কাউকে সদরুল আফাযিল নামে স্বরন করতে এ পর্যন্ত শুনা যায়নি।

বংশগত ধারায় তিনি ছিলেন 'সৈয়্যদ' খান্দানের। তার পিতা হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন স্বীয় যুগে উল্লেখযোগ্য আলিমেদ্বীন ও কবি। তিনি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান ফাযিলে বেরলবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহির)র মুরিদও ছিলেন।

হুযুর সায়্যিদি সদরুল আফাযিল'র দাদা ও পরদাদা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমিনউদ্দিন ও মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ করিমউদ্দিন আলাইহিমার রাহমাহও আপন যুগে প্রসিদ্ধ আলেম ও বুযর্গদের মধ্যে বিবেচিত হতেন।

ইলম অর্জন :

সায়্যিদি সদরুল আফাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিকভাবে পিতার সংস্পর্শে থেকে প্রাইমারি শিক্ষা গ্রহণের পর আট বছর বয়সে হাফেয সৈয়্যদ নবী বখশ ও হাফিয হিফজুল্লাহ খাঁনের কাছে কুরআনুল কারিম হিফয্ করেন। অতঃপর যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে রব্বানীদের সুহবাতে থেকে ছরফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক, উসূল, ফিকহ্ সহ বিবিধ বিষয়ে ইলমে দ্বীন হাসিল করেন। গভীর পান্ডিত্য হাসিলের লক্ষ্যে মুহাদ্দিসে দাওরা, কিবলায়ে উলুম ও হিকমাহ, অলিয়ে কামিল আল্লামা সৈয়্যদ গোল মুহাম্মদ কাহেলি কাদেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)র সান্নিধ্যে চলে যান এবং তার কাছ থেকে ইলমে হাদিস ও সনদে হাদিসের উপর দস্তারে ফজিলত লাভ করেন।

১৩৩০ হিজরি, ১৭০২ ইংরেজি সনে কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ , তারিখ, সিয়ার, ফালসাফাহ সহ সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে স্বয়ংসম্পুর্ণ হয়ে ফিরে আসেন।

উস্তাদগণের তালিকা

* পিতা হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মঈনুদ্দীন নুযহাত মুরাদাবাদী (রহঃ)
* হাফেজ সৈয়্যদ নবী বখশ (রহঃ)
* হাফেজ হিফজুল্লাহ্ খাঁন (রহঃ)
* আল্লামা শাহ্ ফজলে আহমদ আমরোহী (রহঃ)
* মুহাদ্দিসে দাওরা আল্লামা সৈয়্যদ গোল মুহাম্মদ কাহেলি কাদেরী (রহঃ)

বায়আত ও খিলাফাতে তরিক্বত:

সদরুল আফাযিল, ফখরুল আমাছিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পর স্বীয় উস্তাদ হযরত গোল মুহাম্মদ কাহেলি কাদেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র কাছে কাদেরীয়া তরিক্বায় বায়আত গ্রহণ করেন অতঃপর আলে রাসূল, আউলাদে গাউসুল আযম, শাবিহে গাউসুস সাক্বালাঈন, আ'লা হযরত, শায়খুল মাশায়েখ হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন আশরাফি জিলানী (কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহু)'র সুহবাতে নিজেকে সোপর্দ করেন। মহান এ আধ্যাত্ম সম্রাটের রুহানী ফায়য লাভের মধ্যদিয়ে তরিক্বায়ে আশরাফিয়ার খিলাফত ও ইজাযত লাভ করেন।

এছাড়াও তিনি আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, শাহ্ মাওলানা আহমদ রযা খাঁন ব্রেলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শরফে বায়আত ও বারাকাতিয়া রজভীয়া তরিক্বার খিলাফত লাভে ধন্য হন।

"খুলাফায়ে আ'লা হযরত" কিতাবের ৩৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

মুজাদ্দিদে ইসলাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রযা ফাযিলে ব্রেলবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সৈয়্যদি হযরত সদরুল আফাযিল 'র জ্ঞান গভীরতা ও একনিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। স্বীয় মুরিদ হওয়া সত্বেও "আউলাদে রাসুল "হবার কারণে আ'লা হযরত কিবলাহ তাকে অসম্ভব সম্মান ও স্নেহ করতেন।

আ'লা হযরত কিবলাহ যেমন উনাঁকে মুহাব্বত ও স্নেহের চোখে দেখতেন, সদরুল আফাযিলও আ'লা হযরত কিবলাহ' কে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও আনুগত্য করতেন।

খিদমতে দ্বীন: ইলমে দ্বীন চর্চায় মুসলিম মিল্লাতকে ব্রত করবার লক্ষ্যে তিনি ১৩২৮ হিজরি সনে মুরাদাবাদ শহরে মাদরাসা -এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৩৫২ হিজরি সনে মাদ্রাসাটির কলেবর বৃদ্ধি করে "জামেয়া-এ নঈমীয়্যাহ্ মুরাদাবাদ" নামে নামকরণ করা হয়। তৎকালীন হিন্দুস্থানে এ ইদারা পরিপুর্ণ ইলমে দ্বীন অর্জনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। সারা বিশ্বের জ্ঞান তলবকারীরা হুযুর সদরুল আফাযিলের সান্নিধ্যে থেকে সময়ের শ্রেষ্ঠ আলিম হবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

তার শিষ্যদের মধ্যে কজন,

* তাফসীরে নঈমী, ও তাফসীরে নূরুল ইরফান, জাআল হক্ব সহ শতাধিক কিতাবের প্রণেতা হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী আশরাফী বদায়ুনী গুজরাট, হিন্দুস্তান।
* আল্লামা আবুল হাসনাত আহমদ কাদেরী।
* শায়খুল হাদিস আল্লামা আবুল বারাকাত কাদেরী, লাহুর, পাকিস্তান।
* তাফসীরে জিয়াউল কুরআনের লেখক আল্লামা পীর মুহাম্মদ করম শাহ্ আযহারী।
* ফকীহে আযম আল্লামা নূরুল্লাহ বছিরপুরী, ভারত।
* আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ ওমর নঈমী মুরাদাবাদ।
*আল্লামা গুলাম মঈনুদ্দীন নঈমী, মুরাদাবাদ।
* আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ হুসাইন নঈমী, লাহুর, পাকিস্তান।
* মাওলানা গোলাম ফখরুদ্দিন নঈমী গানগী, ভারত।
* মুফতি আব্দুর রশিদ খাঁন ফতেহপুরী, ভারত।

বাংলাদেশে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম যারা

* শায়খুল হাদীস আল্লামা সৈয়্যদ নুরুচ্ছাফা নঈমী আশরাফী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
* শাহসুফী হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ বিসমিল্লাহ শাহ নঈমী নকশবন্দী, রাঙ্গুনিয়া।
* মুফতি ওলিউল্লাহ শাহ নঈমী, রাউজান।
* হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান নঈমী, রাউজান।
* মাওলানা হারুনুর রশিদ শাহ নঈমী আমিরী, পটিয়া। প্রমুখ।

গ্রন্থাবলী

বহু গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে সদরুল আফাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান তার অনবদ্য অবদান। বিশেষ করে বেশ কটি কিতাব লিখে দেওবন্দী- ওহাবী মতবাদের প্রচারক ইসমাঈল দেহলবীর মুখোশ উন্মোচন করে তিনি সরলমনা মুসলমানদের ঈমানের হিফাযত করেন। তার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আত্বইয়াবুল বয়ান ফি রদ্দি তাক্বিয়াতুল ঈমান, ইহকাক্বে হক্ব, সাওয়ানিহে কারবলা। ইত্যাদি।

ওফাত: ১৮ যিলহজ্ব ১৩৬৭ হিজরী, ২৩ অক্টোবর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এ মহান মনীষী ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামেয়া নঈমীয়ার মূল ফটকের সামনে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ১৬, ১৭, ১৮ যিলহজ্ব ৩ দিনব্যপী তাঁর উরসে পাক অনুষ্ঠিত হয়।

الحمد لله ذى العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرام والعظام والنعمة الالاء وازكى الصلوة واطيب السلام علىٰ سيد الطاهرين امام المرسلين خاتم الانبياء المتوج بتيجان الاصطفاء وعلى اله البرزة الاتقياء واصحابه الرحماء والخلفاء والشهداء الذين قتلوا فى سبيله باشد الظلم والجفاء۔ اما بعد۔

“রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ভালোবাসা”

আল্লাহ তায়ালা যাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছেন, তিনি ইয়াক্বীনের সাথে জানেন যে, যেই সত্তার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য ঈমানের অন্তর্ভূক্ত তাকে মানা ব্যতিত কোন বান্দাহ মু'মিন হতে পারে না। ঐ সত্তার ভালোবাসা সমূহ জগতের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। এমনকি মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন যাদের অধিকার আদায় করা মানবজাতির জন্য আবশ্যক, যদি কোন ব্যক্তি কখনও তাদেরকে ভুলে যায় এবং তার অন্তরে ঐ আপনজনের জন্য সামান্য পরিমাণ ভালবাসা অবশিষ্ট না থাকে, তাদের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক যদি সমূলে উচ্ছেদও হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও তার ঈমানে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি আসবেনা। কেননা ঈমান গ্রহণকালে মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকে মানা লাযিম বা আবশ্যক ছিল না। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে মানা মু'মিনের জন্য আবশ্যক ছিল। যতক্ষণ “লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ'র সাথে মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ'র বিশ্বাস স্থাপনকারী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারবে না। যদি তার সম্পর্ক প্রিয় নবীর ভালবাসার সাথে না হয়, দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সে ব্যক্তি ঈমান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কারণ রিসালাতের সত্যায়ন নবীর প্রেম ব্যতিত অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য পবিত্র শরীয়ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নবীর প্রেম-ভালবাসাকে নিজের সমস্ত পরিবার-পরিজনের চেয়েও অত্যাবশ্যকীয় বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

কুরআনুল কারীম হতে আয়াত-(এক):-
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْن

অনুবাদ :- হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ মনে করো না। যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তবে তারা যালিম। (সুরা তাওবাহ, আয়াত-২৩)

আয়াত (দুই):-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْن

অনুবাদঃ আপনি বলুন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পূত্রগণ, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠি, তোমাদের অর্জিত সম্পত্তি তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা কর এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান এসব বস্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পানে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত এবং আল্লাহ ফাসিকদেরকে সৎপথ প্রদান করে না। (সুরা তাওবাহ আয়াত-২৪)

আয়াত-(তিন):- وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদঃ- এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সুরা তাওবা আয়াত-৬১ আয়াতের শেষাংশ)

আয়াত-(চার):- وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوْهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদঃ এবং আল্লাহ ও রাসূলের এ হক অধিক ছিলো যে, তাকে সন্তুষ্ঠ করবে, যদি তারা ইমান রাখতো। (সুরা তাওবাহ আয়াত-৬২)

আয়াত-(পাঁচ):-

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ

অনুবাদঃ তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি বিরোধিতা করে আল্লাহ ও রাসুলের, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই বড় লাঞ্ছনা। (সুরা তাওবাহ আয়াত-৬৩)

আয়াত (ছয়):- وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অনুবাদঃ এবং তারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে, এরাই তো ঐ লোক, যাদেরকে সত্বর করুণা করেন। নিশ্চয় মহান আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাপূর্ণ। (সুরা তাওবাহ)

আয়াত নং- (সাত):-

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُوْلِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ

অনুবাদঃ- মদীনাবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত ছিলো না যে, আল্লাহর রাসুল থেকে পিছনে বসে থাকবে এবং না এও যে, তারা জীবনের চেয়ে

নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে। (সুরা তাওবাহ আয়াত-১২০'র প্রথামাংশ)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ হতে বুঝা যায় যে, পিতা- মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আম্বিয়া, আওলিয়া, প্রিয় সন্তান, নিকটতর্ম্মীয় বন্ধু বান্ধব, সম্পদ, বাসস্থান, মাতৃভুমি ইত্যাদির ভালোবাসা হতে এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামার ভালোবাসা অধিক জরুরী ও আবশ্যক।

হাদীসে নববী হতে

হাদীস নং-(এক)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده
وولده والناس اجمعين

অনুবাদঃ- হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে নিজের মা-বাবা সন্তান-সন্ততি ও সমূহ মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হবো। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান)

হাদীস নং-(দুই)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من
كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما وعن احب عبدا لايحبه الاالله ومن يكره ان
يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار–

অনুবাদঃ হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন- তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যায় সে ঈমানের স্বাদ লাভ করে ১. যার নিকট পৃথিবীর সবকিছু থেকে আল্লাহ ও রাসুল অধিক প্রিয়। ২. যে ব্যক্তি কোন বান্দাহকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। ৩. যে ব্যক্তি কুফর থেকে মুক্ত হবার পর পুনরায় কুফুরী পথে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমনটা নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করাকে অপছন্দ করে। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান)

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীকে প্রিয় জানা নবীজির ভালোসার অন্তর্ভুক্ত। কুদরতীভাবে মানুষ যার জন্য ভালোবাসা রাখে, সে ভালোবাসার পাত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীর সবকিছুকেও প্রিয় জানে। এমনকি হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে যারা ভালোবাসে, তারা নবীজির প্রতিবেশী এবং প্রিয় নবীর সাথে নিসবাত আছে এমন সমূহ সম্পর্ককে প্রাণ ও অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

হাদীস নং-(তিন)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبوا العرب لثلاث لانى
عربى والقران عربى و كلام اهل الجنة عربى–

অনুবাদঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিত, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তোমরা আরববাসীকে তিন কারণে ভালোবাসো ১. আমি আরবী, ২. কুরআন আরবী, ৩. জান্নাতবাসীর ভাষা আরবী। (শুয়াবুল ঈমান, কৃতঃ ইমাম বায়হাক্বী)

হাদীস (চার):-

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش
العرب لم يدخل فى شفاعتى ولم تنله مودتى–

অনুবাদঃ- হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আরববাসীকে ঘৃণা করবে সে আমার শাফায়াত (সুপারিশ)'র অন্তর্ভুক্ত হবেনা এবং আমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাক্বিব)

(উল্লেখ্য হাদীসটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত। তদুপরি এ জাতীয় অবস্থানে দূর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য)

হাদীস নং (পাঁচ):-

عن سلمان رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبغضى
فتارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب
فتبغضنى–

অনুবাদঃ হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে বলেছেন, আমাকে ঘৃনা করো না, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্ রাসুল! আপনাকে কি করে ঘৃনা করি অথচ আপনার বদান্যতাই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, আরববাসীকে ঘৃণা করা মানেই আমাকে ঘৃণা করা হয়।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ হতে পরিষ্কার বুঝা যায়, হুজুরে পাক আক্বাঁ আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে আহলে আরব বা আরববাসীকে ভালোবাসা মুমিনের জন্য আবশ্যক এবং ঈমানের নিদর্শনও বটে। পক্ষান্তরে যদি কারো হৃদয়ে আরববাসীর জন্য ন্যূনতম বিদ্বেষ থেকে থাকে, তবে তা ঈমানের দুর্বলতা এবং নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি ভালোবাসা উদয়ের অন্তরায়। কারণ আরববাসীরাতো

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মাতৃভূমির বাসিন্দা। অনুরূপ আক্বা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তু নিরেট ঈমানদারের কাছে শ্রদ্ধেয় ও হৃদয়ের প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় নবীজির "কদমগাহ" বা যে স্থানে প্রিয় নবী পা মুবারক রাখতেন, সে স্থানটিকে যার পর নাই সম্মান করতেন।

এমনকি মিম্বার শরীফের যে স্থলে হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাশরীফ রাখতেন, সে মুবারক স্থানে খলিফায়ে আউয়াল হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোন দিন বসার সাহস দেখাননি এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিম্বার শরীফের সে স্থানে বসতেন সে স্থানে বাসার কোন দিন হিম্মত দেখাননি। অনুরূপ তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফারুকে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্থানে বসার সাহস দেখাননি (তারবানী)।

এসব থেকে অনুমান করা উচিত যে, হুযুর আলাইহিস সালামের সাহাবা ও বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে আবশ্যক জানা-কী পরিমান জরুরী! অকাট্যতার সঙ্গে বলা চলে যে, সাহাবা ও আলে রাসুলের ভালোবাসা মানে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা আর হুজুর আলাইহিস সালামকে ভালোবাসাই হলো প্রকৃত ঈমান।

হাদীস নং-(ছয়)

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقداذانى ومن اذانى فقداذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه–

অনুবাদঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাগফাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলে মাক্ববুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা "আল্লাহ আল্লাহ" বলে পুনরাবৃত্তি করলেন, আর বললেন, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তাদেরকে নিশানা বানিওনা। যারা তাদেরকে ভালোবাসে আমার ভালোবাসা কারণেই ভালোবাসে। আর যারাই তাদেরকে ঘৃণা করে বস্তুত পক্ষে তারা আমাকে ঘৃনা করলো। যারা তাদেরকে কষ্ট দিলো বস্তুত পক্ষে তারা আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো মুলত আল্লাহকে কষ্ট দিলো এবং যে আল্লাহকে কষ্ট দিলো অনতিবিলম্বে আল্লাহ পাক তাকে পাকড়াও করবেন।

মুসলমানদের উচিত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং অন্তরে তাদের প্রতি মুহাব্বত ও আকিদাতকে স্থান দেয়া। যে দূর্ভাগা সাহাবায়ে কিরামের শানে গুস্তাগী করে, তাদের সম্পর্কে কটাক্ষ মূলক মন্তব্য করে, প্রকৃত মুসলমান যেনো ঐ প্রকারের (গুস্তাখ) বেয়াদবদের এড়িয়ে চলে।

হাদীস নং (সাত্তঃ)

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رائيتم الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم–

অনুবাদঃ হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন যখন তোমরা দেখবে ঐ সব লোকদের, যারা আমার সাহাবাদের গালমন্দ করছে, তখনি তোমরা বলো তোমাদের মন্দের উপর মহান আল্লাহর অভিশম্পাত নাযিল হোক! (তিরমিযী, আওয়াবুল মানাক্বিব)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় থেকে সাহাবায়ে কিরামের মরতবা, তাদের প্রতি মুহাব্বাত, একনিষ্টতা আদায় ও সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতি কটুক্তিকারীদের থেকে দূরে থাকার নিদের্শনা প্রমানিত। এ কারণে আহলে সুন্নাতের জন্য জায়েয নেই যে, শিয়া সম্প্রদায়ের কোন মজলিস বা মাহফিলে অংশগ্রহণ করা। সাহাবায়ে কিরামের দুশমনদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা করা কোন খালিসুল ইতিক্বাদ" বা নিরেট মুমিনের কাজ হতে পারে না। মানুষ যেখানে নিজের শত্রুদের সঙ্গে উঠা-বসা চলা-ফেরা এবং খুশিমনে আলাপচারিতা করা অপছন্দ করে থাকে সে স্থানে দুশমনে রাসুল ও দুশমনে সাহাবাদের সাথে মেলামেশাকে কিভাবে পছন্দ করতে পারে? জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সিনিয়র সাহাবাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক, সায়্যিদুনা হযরত ওসমান গণি, সায়্যিদুনা হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীনের মর্যাদা সবার উপরে। নিম্নে তাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হলো-

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র নাম "আবদুল্লাহ"। তাঁর পূর্ব পুরুষগনের নাম সমূহ হলো- আবদুল্লাহ (আবু বকর) ইবনে আবু কুহাফা ওসমান ইবনে আমের ইবনে আমার ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব কুরশী। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নসব বা বংশধারা হযরত সৈয়্যদ আলম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার বংশের সাথে "মুররাহ" তে গিয়ে মিলে যায়। তাঁর উপাধি হলো আতীক্ব ও সিদ্দিক। হযরত আবু ইয়া'লা স্বীয় 'মুসনাদে' এবং ইবনে সা'দ ও হাকেম (রাঃ) উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি ঘরের ভিতরে ছিলাম আর সিনিয়র সাহাবাগণ ছিলেন ঘরের আঙ্গিনায়। আমি এবং তাদের মাঝে পর্দা ঝুলানো ছিলো। এই অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু

তাশরীফ আনলেন। হুজুরের আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যার কাছে "عتیق من النار" অর্থাৎ 'জাহান্নাম থেকে মুক্ত' ব্যক্তিকে দেখতে ভালো লাগে সে যেনো আবু বকরকে দেখে, সুবহানাল্লাহ! ঐ দিন থেকে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর লকব "আতীক" হয়ে যায়। তাঁর অন্য লবকটি হলো "সিদ্দীক"। ইবনে ইসহাক, হাসান বসরী এবং হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, শবে মি'রাজের সকাল থেকেই তিনি এ লকবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুসতাদরাকে হযরত উম্মুল মু'মিনিন আয়েশাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকগন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু কাছে আসে আর মি'রাজের ঐ ঘটনার বর্ণনা দেয় যা তারা রাসুলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামার কাছ থেকে শুনেছে। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহুকে জিজ্ঞেস করে, হে আবু বকর! এ ঘটনার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন-নিশ্চয় আমার নবী সত্য বলেছেন এবং আমি অবশ্যই হুজুরের সত্যয়ন করছি। মূলতঃ এই কারণেই তাকে "সিদ্দীক" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

- হযরত হাকেম রাহিমাল্লাহু তার বিখ্যাত "মুসতাদরাক" কিতাবে নাযযাল ইবনে উসবুরাহ থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক ঐ ব্যক্তি, যার নাম মহান আল্লাহ হযরত জিবরীল আমিন আলাইসি সালাম এবং সরওয়ারে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র জুবান দিয়ে "সিদ্দীক" রেখেছেন। তিনি এমন জাতে পাক যিনি নামাযে প্রিয় নবীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আমাদের দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য যাকে নবীজি পছন্দ করেছেন। অতএব আমরাও তাঁর খিলাফতের উপর সন্তুষ্ট।

- হযরত আবু ইয়াহয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে দারুকুতনী ও হযরত হাকেম (রাঃ) বর্ণনা করেন। আবু ইয়াহয়া (রাঃ) বলেন। আমি গণনা করে শেষ করতে পারবনা- কতোবার শ্রদ্ধা জানিয়ে হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র জুবান দিয়ে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর নাম "সিদ্দীক" রেখেছেন।

- ইমাম তাবরানী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সহীহ ও উন্নত সনদে হাকিম ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হলফ সহকারে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আবু বকরের নাম "সিদ্দীক" আসমান থেকেই নাযিল করেছেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হুজুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শুভাগমনের দুই বছর কয়েক মাস পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। এটিই বিশুদ্ধ মত। এছাড়া যে কথাটি মশহুর আছে যে, প্রিয় নবীজি নাকি হযরত সিদ্দিককে প্রশ্ন করেছেন "আমি বড় নাকি তুমি বড়?" তিনি আরয করেন হুযুর কীযে বলেন- আপনিই বড়। শুধু আম্যর বয়সটা বেশী। এ বর্ণনা মুরসাল এবং গরীব। বাস্তবে এ ঘটনাটি হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে ঘটেছিলো। হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নয়।

হযরত সিদ্দিক আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মুকাররমাতে বসবাস করতেন। বাণিজ্যের কারণে মাঝে মধ্যে বাইরে সফর করতেন। স্বীয় গোত্রে অনেক বড় ধনী, মানবতাবাদী ও পরোপকারী ছিলেন। জাহেলী যুগে কুরাইশের সরদার এবং মজলিশে শুরা'র রুকন ছিলেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ হিসাবে তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামের কাজেই মনোনিবেশ করেন। অন্য সব দায়িত্ব অন্তর থেকে বিতাড়িত করেন দেন। জাহেলী যুগে তার চাল-চলন অধিকতর পুতঃপবিত্র ছিলো এবং যাবতীয় কার্যাদী ছিলো অত্যন্ত সুদৃঢ় ও প্রশংসিত।

- ইবনে আসাকির আবুল আলীয়া রবাহী থেকে নকল করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের মজলিশে আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, জাহেলী যুগে আপনি কখনো "শরাব" পান করেছেন? তিনি বললেন আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! তারা বলল কেন? তিনি বলেন, আমি স্বীয় মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাকে সংরক্ষণ করতাম অথচ শরাব পানকারীদের মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা দুটোই ধ্বংস হয়ে যায়। এ সংবাদ খানা হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা পর্যন্ত পৌছলে তখন প্রিয় নবীজি দু'বার বললেন, আবু বকর সত্য বলেছে। আবু বকর সত্য বলেছে।

সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের বড় একটি দল একথার উপর জোর দিয়ে থাকেন যে, হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে আসাকির (রাঃ) হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে আগে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঈমান গ্রহণ করেন। একই ভাবে ইবনে সা'দ (রাঃ) আবু রবি দাওসী (রাঃ) থেকে একই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তাবরানী (রাঃ) মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে এবং আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ 'যাওয়ায়িদুয যাহেদ' গ্রন্থে হযরত শা'বী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে প্রশ্নে করেছিলেন, সাহাবায়ে

কিরামের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম কবুলকারী কে? হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু। অতঃপর হযরত হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু রচিত ঐ কবিতাগুলো পাঠ করলেন যা হযরত সিদ্দিক আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু শানে লেখা হয়েছে এবং এ ক্বাসীদা গুলোতেই তার সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার কথা উল্লেখ আছে।

◆ ফুরাত ইবনে সায়ের (রাঃ) হতে আবু নুআঈম (রাঃ) একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। যাতে উল্লেখ রয়েছে, আমি মাইমুন ইবনে মিহরান (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছি, সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কি আবু বকর নাকি হযরত আলী? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বুহাইরা রাহেবের যমানায় ঈমান গ্রহণ করেন, আর ঐ সময় হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু জন্ম গ্রহণও করেননি।

◆ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির একটি বড় দল একথার প্রবক্তা যে, সর্ব প্রথম মুমিন হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু। কেউ কেউ এ বক্তব্যের উপর ইজমাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী রাহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ 'তারিখুল খুলাফা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। যদিও সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, সর্বপ্রথম মুমিন হযরত সিদ্দিক আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কিন্তু কোন কোন হযারাত এ ব্যাপারেও মত প্রকাশ করেছেন যে, সর্ব প্রথম ইসলাম কবুলকারী হলেন হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু। আবার কারো কারো মতে, হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা সর্ব প্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন।

সমাধানঃ

ইমামুল আয়িম্মাহ, সিরাজুল উম্মাহ হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু উপরোল্লিখিত সমস্ত মতামতের আলোকে চমৎকার সমাধান দিয়ে বলেন, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু। নারীদের মাঝে হযরত উম্মুল মু'মিনিন খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা আর নওজোয়ানদের মধ্যে হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু।

নবীজির সঙ্গে প্রথম নামায আদায়কারী

হযরত খায়ছামা (রাঃ) বিশুদ্ধ সনদে হযরত যায়দ ইবনে আরকম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন, সর্ব প্রথম হুযূরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার সঙ্গে নামায আদাকারী ব্যক্তিটি হলেন হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু।

বিনা দ্বিধায় ইমান গ্রহণকারী

ইবনে ইসহাক রাহিমাল্লাহ আনহু এর এক বর্ণনায় এসেছে, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আবু বকর ছাড়া এমন আর কেউ নেই যে ব্যক্তি আমার দাওয়াত পাবার সাথে সাথেই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ব্যতিত ইমান গ্রহণ করেছে।

হুজুর সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহনের সূচনা থেকে শেষ দম পর্যন্ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার একান্ত সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন। সফর ও স্থিরে কোথাও হুযুর আলাইহিস সালাম হতে পৃথক হননি হজ্জ ও যুদ্ধ ব্যতিত। যার অনুমতি নবীজী তাকে দিয়েছিলেন। এমনকি জীবনে আক্বা আলাইহিস সালাম ছাড়া কোন দিন সফর করেননি। তিনি ছিলেন নবীজির সমস্ত কাজের প্রত্যক্ষদর্শী। নবীজির প্রতি তার ভালোবাসার দৃষ্টান্ত এমন যে, নিজের পরিজন, সন্তান-সন্ততিকে রেখে প্রিয় নবীর সঙ্গে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। ব্যক্তিগত চরিত্রে তিনি ছিলেন উঁচু মর্যাদার দানশীল। ইসলাম গ্রহণকালে নিজের কাছে সঞ্চিত চল্লিশ হাজার দীনার ইসলামের পরিধি বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করে দেন। গুলাম আযাদ করা ও মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা ছিলো তার প্রিয় কাজের অন্যতম। দয়া-দক্ষিন্যে প্রসিদ্ধ হাতিম তাঈও তার সমকক্ষ নয়। হুযুর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উপর কারো কোনো বদান্যতা অবশিষ্ট নেই। আছে কেবল আবু বকরের। তাঁর প্রতিদান মহান আল্লাহ রোয কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন। কারো অর্থ-বিত্ত আমাকে এতটুকু উপকৃত করেনি যতটুকু আবু বকরের মাল আমাকে উপকৃত করেছে। (হযরত আবু হুরায়রা (রঃ)'র বর্ণনায় তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে)

খোশ কিসমত! হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর, যার শানে স্বয়ং কায়েনাতের সুলতান আক্বা আলাইহিস সালাতু সালাম এমন বাক্য বলেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন সাহাবাদের মাঝে অধিক জ্ঞানী ও প্রখর মেধাবী। এ বিষয়টি সমস্ত সাহাবা এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন। কুরআন তিলাওয়াত, ইলমে আনসাব বা বংশ জ্ঞান, ইলমে তা'বীর ইত্যাদিতে তিনি উচু স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফিয। (আত তাহযীব, ইমাম নববী (রঃ)

আফজলীয়াত/শ্রেষ্ঠত্বঃ

এ সিদ্ধান্তের উপর আহলে সুন্নাতের ইজমা রয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পরে সমূহ জাহানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুই শ্রেষ্ঠ। এরপরই হলেন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু অতঃপর হযরত ওসমান গণী

রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু তাদের পরে যিনি সবচেয়ে মর্যাদাবান-তিনি হলেন, হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু। ক্রমান্বয়ে আশারায়ে মুবাশশারাহ, আহলে বদর ও আহলে উহুদ। তাদের পরে রয়েছেন সমস্ত আহলে বায়ত অতঃপর বাকী সাহাবাকুল। এই "ইজমাটি হযরত মনসুর বাগদাদী (রহ:)ও নকল করেছেন।

◆ ইবনে আসাকির (র:) হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপস্থিতিতেই আবু বকর অতঃপর হযরত ওমর অতঃপর হযরত ওসমান অতঃপর হযরত আলী রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়িনকে মর্যাদা দিতাম।

◆ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য মুহাদ্দিসিনগণ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে রিওয়ায়াত নকল করেন যে, মওলা আলী বলেন, এ উম্মতের মাঝে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরে অধিকতর উত্তম হলেন হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা।

◆ ইমাম যাহবী (র:) বলেন, হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে ধারাবাহিক বর্ণনা আছে যে, ইবনে আসাকির (র:) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা বর্ণনা করেছেন, হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে উত্তম বলবে আমি তাকে 'মুফতারি' বা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেবো।

হযরত সিদ্দিক আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর শানে বহু আয়াত এবং বহু সংখ্যক হাদীস বিবৃত রয়েছে। যা দ্বারা তার মহান মর্যাদা ফুটে উঠে। কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আনহুকে বললেন, হে আবু বকর! তুমি আমার বন্ধু হাউজে কাউসারে, তুমি আমার সাথী গারে সাওরে।

২. ইবনে আসাকির (র:)'র আরেক বর্ণনায় এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, নেকী বা পূণ্যের তিনশত ষাটটি বৈশিষ্ট্য থাকে। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! ঐ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটি কি আমার মাঝে আছে? নবীজী বললেন। সব বৈশিষ্ট্যই তোমার মাঝে বিদ্যমান! তোমায় মোবারকবাদ।

৩. ইবনে আসাকির (র:) আরো বর্ণনা করেন হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা ইরশাদ করেন, আবু বকরের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা আমার সমস্ত উম্মতের উপর ওয়াজিব।

৪. ইমাম বুখারী (র:) হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইরশাদ করেন, হযরত আবু বকর হলেন আমাদের সরদার ও প্রধানতম ব্যক্তি।

৫. ইমাম তাবরানী (র:) আওসাত গ্রন্থে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা। কারো হৃদয়ে আমার প্রতি ভালোবাসা আর আবু বকর ও ওমরের প্রতি ঘৃনা এক সাথে একত্রিত হবে না।

ব্যাখা: এ হাদীস খানা শিয়া মতবাদ ভ্রান্ত হওয়ার আরো একটি দলিল। তারা এই মহান দুই সাহাবার প্রতি ঘৃনা পোষন করে আর অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। অন্য দিকে হযরত আলী (রা.) ও আহলে বায়তের প্রতি বিকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করে। অথচ হযরত আলী (রা.) ইরশাদ করলেন আমার প্রতি ভালোবাসা আর আমার আবু বকর ও ওমরের প্রতি ঘৃণা কখনোই এক অন্তরে জমা হতে পারে না। তার মানে যে আমাকে মুহব্বত করবে সে অবশ্যই আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা কে মুহাব্বত করবে। কারণ আবু বকর ও ওমরের প্রতি ভালবাসা আমার প্রতি ভালোবাসা থেকে কখনও পৃথক হতে পারে না।

খিলাফত: কুরআনে পাকের বহু আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে রাসুল হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। ইমাম তিরমিযী ও হযরত হাকেম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সাহাবী হযরত খুবাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার স্থালভিষিক্ত হলো আবু বকর ও ওমর। তোমরা তাদের অনুসরণ করো।

◆ ইবনে আসকির (র:) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন, এক মহিলা হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমাতে হাযির হলো। বেশ কিছু বিষয় জানতে চাইলো। অত:পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাকে বললেন আবার আসবে। মহিলাটি আরয করলো, যদি আমি পুনরায় আসি আর হুযুরকে না পাই অর্থাৎ ঐ সময় যদি হুযুর ইহজগত থেকে পর্দা করেন। তখন নবীজি বললেন, যদি তুমি পুনরায় আস আর আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের খিদমাতে হাযির হবে। কেননা আমার পরে সেই আমার খলিফাহ।

◆ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলো। তখন নবীজি বললেন আবু বকর কে হুকুম দাও যাতে নামাজের ইমামতি করেন। তখন হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা বললেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! তিনি কোমল ও নম্র হৃদয়ের মানুষ! আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি কি নামাযে ইমামতি করতে পারবেন? নবীজি আবারো বললেন তাকে আদেশ করো যাতে নামায পড়িয়ে দেয়। হযরত আয়েশা আবারো একই ওযর পেশ করলেন, নবীজিও পুনরায় ঐ একই আদেশ দিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু নবীজির জীবদ্দশায় নামাযে ইমামতি করলেন (এটি হাদীসে মুতাওয়াতির)

উল্লেখ্য যে, হাদীস খানা হযরত আয়েশা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ, ইবনে সায়ীদ, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহুম প্রমূখ রাবী হতে বর্ণিত আছে। ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, এ হাদীস দ্বারা অনেক কিছু বুঝানো হয়েছে। যেহেতু সিদ্দিক আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত সাহাবা হতে উত্তম। অতএব তিনিই খিলাফত ও ইমামতের জন্য সবার থেকে অধিক হকদার ও নিকটবর্তী।

◆ হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এমন এক সময় ইমামতের আদেশ দিলেন যখন আনসার ও মুহাজিরিন একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। হাদীসে আছে যে, জাতির ইমামতি তিনিই করতে পারেন যিনি সবচেয়ে ভালো কিরাত জানেন। বুঝা গেলো হযরত সিদ্দিক সমূহ সাহাবাদের মধ্যে ক্বিরাতে অধিক ভালো ছিলেন এবং কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন একারনেই সমূহ সাহাবা তাকে "احق بالخلافة"খিলাফতের অধিক যোগ্য হিসেবে দলিল গ্রহন করেছেন। যে সব সাহাবী ইমামতের বিষয়কে দলিল মেনেছেন তাদের মধ্যে আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ও হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুমা অন্যতম। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আরেকটি দল হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকে পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) এ বিষয়ে তার বিখ্যাত "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়াও খিলাফতে রাশেদার উপর সমগ্র সাহাবা এবং উম্মত কুলের "ইজমা"ও প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ খিলাফতের অস্বীকারকারী শরীয়ত বিরোধী ও গুমরাহে বদদ্বীন।

হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকাল ছিলো মুসলিম মিল্লাতের জন্য রহমতের ছায়া স্বরূপ। দ্বীনে মুস্তফার উপর আবারো ভয়ংকর দুরাবস্থা এবং ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির বিপক্ষে হযরত আবু বকরের সঠিক রায়, বিশুদ্ধ তাদবীর, পরিপূর্ণ দ্বীনদারী এবং সুন্নাতের জবরদস্ত অনুসরন ছিলো সমৃদ্ধশালী ও প্রতিরক্ষা মূলক। যা দ্বারা ইসলামের পূর্ণ দৃঢ়তা অর্জন হয়েছে। ফলে কাফির মুনাফিকদের কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে। দূর্বল ঈমানদারের পরিপক্ক ঈমান হাসিল হয়েছে। যদিওবা খিলাফতে রাশেদার মধ্যে তার খিলাফতকাল ছিলো একেবারে নগন্য কিন্তু তার সময়ে ইসলামের যে বিরাট মজবুত করণ এবং শক্তি সঞ্চয় হয়েছে তা দীর্ঘ রাজত্বের সুদৃঢ় করণের চেয়েও অধিক মজবুত এবং যে হুকুমাতের সঙ্গে অন্য কোন হুকুমাতের তুলনাই হয় না।

সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফত কালের কিছু ঘটনা প্রবাহঃ

হুযুর সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহু জায়শে উসামাকে বাস্তাবায়ন করেছিলেন। ওসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু যে বাহিনীকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর মুবারক সময়ের শেষ মুহূর্তে শামের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। যা এখনো মদীনার অদুরে অবস্থান করছিল। মকামে যি-খাশব" নামক অঞ্চলেই ছিলো। ইতোমধ্যেই রাসুল কায়েনাত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুনিয়া হতে পর্দা করেন। এ সংবাদ মদীনার প্রত্যেন্ত এলাকার ছড়িয়ে পড়লে বহু আরব ইসলাম থেকে বিমুখ হতে শুরু করলো আর মুরতাদ হতে লাগলো। সাহাবায়ে কিরাম সকলে সমবেত হয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জায়শে উসামা বা হযরত উসামার ঐ বাহিনীকে ফিরিয়ে আনার জন্য জোর আহবান জানালেন। সে সময় ঐ বাহিনীকে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা কোন ভাবেই সঠিক মনে করছেন না কেউ। একদিকে মদীনার আশেপাশে অনেকেই দ্বীন থেকে ফিরে যেতে লাগলো, অন্যদিকে সৈন্য সামন্তের একটি দল যদি শাম দেশে চলে যায় তাহলে ইসলামের জন্য নাজুক অবস্থায় সৃষ্টি হবে।

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওফাতের পর কাফির দলের হাওসালাহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তাদের মৃত হিম্মাতের প্রাণ সঞ্চার হচ্ছিলো। এদিকে মুনাফিক চক্রও ভাবছিলো যে, এখনই আসল খেলাটা প্রদর্শনের সময় এসেছে। দূর্বল ইমানদাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মুসলমানরা এত বেশী অসহায়ত্ব অনুভব করেছে যে, যার নযীর পৃথিবীর চক্ষু পূর্বে কখনো দেখেনি। হৃদয় তাদের বিগলিত ছিল। নয়ন তাদের অশ্রুসিক্ত। খাবার দাবারে অনিহা প্রকাশ পাচ্ছে। জীবনের অপ্রত্যাশিত মুসীবাত চোখের সামনে হাযির! ঠিক সে সময়ে পিয়ারা নবীর জানশীনের পক্ষে শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনকে সামলানো, মুসলমানদের হিফাজত করা, মুরতাদদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দমন করা কতইনা কঠিন কাজ। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক প্রেরিত

লশকর বাহিনীকে ফিরিয়ে আনা, নবীজীর মুবারক সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সাহসিকতা প্রকাশ করা আপাদমস্তক সিদ্দিকের পক্ষে সমন্বয় সাধন কোনমতেই সম্ভব হচ্ছিলনা। তিনি মনে করছেন দুনিয়াতে এটি তার কাছে সব থেকে কঠিন কাজ। তার উপর সৈন্য বাহিনীকে ফিরিয়ে নেয়ার পক্ষে সাহাবাদের অতি জবরদস্তিও চলছিলো চরমভাবে। এছাড়া হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ফিরে আসা এবং হযরত সিদ্দিক আকবর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এই বলে আরয করা যে, হে আমিরুল মু'মিনিন! আরব গোত্রগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করতে তারা এক পায়ে দাড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় পরীক্ষিত বাহাদুর আমার বাহিনীতে মওজুদ আছে। এ মুহূর্তে তাদেরকে রোমে পাঠিয়ে দেয়া, এবং এমন বীর সিপাহসালারদেরকে দেশ থেকে মুক্ত রাখা উচিত হবেনা। এ কাজটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর জন্য খুবই দুষ্কর ছিলো। সাহাবায়ে কিরাম এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এ কঠিন মুহূর্তে যদি হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর স্থলে অন্য কেউ হতেন, তবে তার পক্ষে স্বাধীন চিত্তে স্থির থাকা সম্ভব হতোনা। মুসীবত ও দুশ্চিন্তার জট এবং স্বীয় জামায়াতের পেরেশানীকে আরো হজবরল করে দিতেন। কিন্তু 'আল্লাহু আকবার'! হযরত সিদ্দিকের দৃঢ় অবস্থানে দানা পরিমান পিচ্ছিলতা স্থান পায়নি। তার স্বাধীন চিত্তে এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। তিনি ঘোষনা দিলেন। যদি কোন পাখী আমার শরীরের গোশত ছিড়ে নেয় তো আমার পক্ষে তা বদরদাশ করতে অসুবিধা হবে না কিন্তু হুজুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মুবারক সিদ্ধান্তের খিলাফ নিজের রায়কে প্রতিষ্ঠিত করা, নবীজীর প্রেরিত সৈন্য বাহিনীকে ফিরিয়ে আনা আমার পক্ষে বরদাশত হবে না। এ দুরুহ কাজ বাস্তবায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি ঐ বাহিনীকে শেষতক শামের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েই দিলেন। এ সিদ্ধান্ত থেকে হুজুর সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর অসীম বীরত্ব, অপরিমেয় যোগ্যতা ছাড়াও পূর্ণ সত্য-নির্ভরতার পরিচয় মিলে। এমনকি শত্রু পক্ষও একথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরে খিলাফত ও স্থাভিষিক্তের জন্য 'মহান যোগ্যতা' হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে দান করেছেন।

সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে যে সকল গোত্র মুরতাদ হবার জন্য প্রস্তুত ছিলো, তারা ধারণা করেছিল যে, হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম'র ওফাতের পর ইসলামের শৌর্যবীর্য চুর্ণ-বিচুর্ণ্য হয়ে যাবে। দ্বীনের শান ও শওকত তার অস্তিত্ব হারাবে। তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা বুঝতে সক্ষম হলো যে, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বীয় মোবারক সময়ে ইসলামের জন্য এমন যবরদস্ত শৃংখলা তৈরি করে গেছেন যার বদৌলতে ইসলাম তার শৌর্যবীর্য হারাতে পারে না। কারণ ইসলামের এমন দুরাবস্থা সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াত পৌছানো, দ্বীনের পরিধি বিস্তৃতি এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করে অবকাঠামো তৈরির নিমিত্তে প্রসিদ্ধ শক্তিশালী গোত্রকে হামলা করতে পারা যেনো সহজসাধ্য নয়। অতএব ইসলাম অস্তিত্ব হারাবে, ইসলামের কোন শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না– এমন বদ-ধারণা সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হলো। এখন শুধু ধৈর্য সহকারে দেখার পালা কখন ঐ বীর মুজাহিদগণ মর্যাদা অর্জন করে ফিরে আসে। ব-ফদ্বলে ইলাহি! লশকর বাহিনী বিজিত হলো। রোমীদের নাস্তনাবুদ হলো। যখন লশকর বাহিনী বিজয় বেশে ফিরে এলো, মুরতাদ হবার ইচ্ছা থেকে অবাধ্যরাও দলে দলে পুনরায় ফিরে আসার শুরু করলো আর সত্য সহকারে ইসলামের সঙ্গেই অবস্থান করলো। মুকতাদার-সিনিয়র-বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তদানকারী সাহাবাগণ নিজেদের ভাবনার অবাস্তবতা এবং হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সঠিক রায় ও তাঁর জ্ঞান সমূদ্রের বিশালতা সম্পর্কে অনুধাবন করে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হলেন।

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি:

মানেয়ীনে যাকাত বা যাকাত প্রদানে বাধা সৃষ্টিকারী/অস্বীকারকারীদের বিরোদ্ধে হুযুর হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর পদক্ষেপ ছিলো সুদৃঢ়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো এই, যখন হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওফাতের সংবাদ মদীনার প্রত্যান্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। তখন আবরবের বহু গোত্র মুরতাদ হয়ে যায় । তারাই যাকাতের মুনকির বা অস্বীকারকারী। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যদিও নব ইসলামের নাজুক পরিস্থিতি, শত্রুপক্ষে শক্তিশালী অবস্থান, মুসলামানদের দুর্দশাগ্রস্থ হালত ও বিচ্ছিন্নতার কারণে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এবং অন্যান্য সাহবাগণ পরামর্শ দিলেন যে, এ সংকটাপন্ন মুহূর্তে যুদ্ধের ঘোষণা না দেওয়া শ্রেয় হবে। কিন্তু হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু স্বীয় অদম্য ইচ্ছার উপর অটল ছিলেন এবং তিনি বললেন আল্লাহর কসম! প্রিয় নবীর জীবদ্দশায় একবারের জন্য আল্লাহর নামকে সম্মান করেছে তারা যদি এখন তা অস্বীকার করে তাহলে আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে/ জিহাদে অবর্তীন হবো। একাজে তিনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাথে নিলেন। বেদুঈনরা তাদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে সেনা প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মহান আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। হযরত ওমর ফারুক ও অন্যান্য সহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম হযরত সিদ্দিকের সঠিক সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ হযরত সিদ্দিকে আকবারের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি যা করেছেন যথার্থই করেছেন। যদি সংকটাপন্ন এ মুহূর্তে

দুর্বলতা প্রকাশ করা হতো তাহলে প্রত্যেক কাবিলা/জাতি ইসলামী 'বিধি-বিধানের তাচ্ছিল্য করতো। দ্বীনের বিরোধিতা করবার সাহসিকতা প্রদর্শন করতো। তখন সত্যের শৃংখলা তার অস্তিত্ব হারাতো।

এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত, প্রত্যেক অবস্থায় ইসলামের সংরক্ষণ আর নাহকের বিরোধিতা করা আবশ্যক। যে জাতি অন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে অবহেলার আশ্রয় নেয়, নিশ্চিত তা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আজকালের কিছু বোধহীন মানুষ বাতিল ফিরকাহর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকে। তারা বলে, পরস্পর কাঁদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করো। তাদের উচিত হযরত সিদ্দিক আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এ নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যিনি নাজুক হালতেও বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। কারণ বাতিল দলের কাজই হলো ইসলামের ক্ষতি সাধন করা। অতএব তাদেকে দমানো থেকে বিরত থাকা মানে প্রকারান্তরে ইসলামকে ধ্বংস করা।

ইয়ামামার যুদ্ধঃ

মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সৈন্য বাহিনীকে সাথে নিয়ে ভন্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাবের মুখোমুখি হবার জন্য ইয়ামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ বেশ ক'দিন স্থায়ী ছিলো। অবশেষে মুসাইলামাতুল কাযযাব নামের ঘৃন্য নবুয়ত দাবীদার হযরত ওয়াহশী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাতে (কাতেলে আমীরে হামযাহ) নিহত হয়। ঐ সময় মুসাইলামার বয়স ছিলো ১৫০ বছর। এদিকে ১২ হিজরী সনে হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলা ইবনে হাদ্বরমীকে বাহরাইনে রওয়ানা করালেন যেখানকার অনেক লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। 'জাওয়াসী' নামক স্থানে তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহর অসীম দয়ার বারাকাতে মুসলিম বাহিনী সেখানেও বিজয় অর্জন করে। ওমানে মুরতাদের সংখ্যার আধিক্য দেখা দিলে তিনি হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহলের নেতৃত্বে সেখানে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। বুহাইরাতে মুরতাদদের মুকাবিলার জন্য আবু উমাইয়া ও মুহজিরিনদের প্রেরণ করেন। মুরতাদদের অন্য আরেকটি দলের বিরোদ্ধে মুহম্মদ বিন লাবিদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করেন। ঐ বছরই মুরতাদদের দমন করার পর তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে ইরাকের বসরায় প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইলা ও কিসরা বিজয় করেন। এরপরই হযরত আমর বিন আস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর আরো একটি দল শামে প্রেরণ করেন। জুমাদাল ওখরা ১৩ হিজরীতে ইজনাদাঈনের যুদ্ধে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত অনুগ্রহের বরাকাতে বিজয় অর্জন করেন। একই বছরে মুরুজুস সাফার সংঘটিত হয় সেখানে মুশরিক বাহিনী দারুনভাবে পর্যুদস্ত হয়। সামান্য সময়ের খিলাফতকালে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইসলামের বিরোদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সমূহ চক্রান্তকে নিমিষেই দমন করেন। ইসলামের মুরতাদদের গণজোয়ারকে প্রতিহত করেন। ফলে কাফিরদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি সম্মানবোধ আরো পরিপক্ক হলো এবং মুসলামানদের শৌর্যবীর্য ও অভিবাদন আরব ও আজমের আকাশে বাতাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

কুরআন সংকলন

এ কথা অনস্বীকার্য যে, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু পবিত্র কুরআনের প্রথম সংকলক। তার আমলে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে একাজটি অন্যতম। তিনি অনুধাবন করলেন যে, বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিযে কুরআন সাহাবাগণ শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন। ফলে সংশয় প্রকাশ করলেন যে, যদি এমনটা চলতে থাকে তো একজন হাফেযও আর বাকী থাকবে না ।মুসলমানরা অতিদ্রুত কুরআনহারা হয়ে পড়বে। অতএব দ্বীনি দায়িত্ববোধ থেকে তিনি সাবাহাবায়ে কিরামের একটি দলকে কুরআন সংকলনের নিদের্শ প্রদান করেন এবং ধারাবাহিক "মাসাহিফ" তৈরিতে অনুপ্রেরণা যোগিয়ে যান।

ওফাত/ইন্তিকাল

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু পৃথিবীতে অদ্বিতীয় উম্মাত যার ওফাতের একমাত্র কারণ ছিলো হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র ওফাত। নবীজির বিচ্ছেদের কারনে হযরত সিদ্দিকের শেষ নি:শাস পর্যন্ত একটি মুহুর্তের জন্যও বেদনার হ্রাস ছিলনা। নবীজির ওফাত দিবস থেকে তার দেহ মোবারক বিচ্ছেদের যাতনায় ক্ষীন হয়ে পড়েছিলো। অবশেষে ১৩ হিজরি সনের জুমাদাল ওখারায় সোমবার তিনি গোসল করলেন। শীতের দিন ছিলো প্রচন্ড জ্বরে কাতর হয়ে পড়েন। নাজুক এ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম চিকিৎসা করানোর জন্য চিকিৎসক ডাকার অনুমতি চাইলে খলিফায়ে রাসুল হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, ডাক্তারতো আমাকে দেখেই নিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন হে খলিফায়ে রাসুল! ডাক্তার কী বললো? তিনি ফরমালেন "انی فعال لما ارید" আমি যা ইচ্ছা করি তাই বাস্তবায়ন করি। তার এ উত্তরের মানে হলো, চিকিৎসকতো মহান আল্লাহ। বিচারকও তিনি। তার ইচ্ছার বিরোধিতা করবার সাধ্য আছে কি? এতে হযরত আবু বকরের পূর্ণ তাওয়াক্কুলের পরিচয় মিলে। তিনি মালিকে হাক্বীকির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ঠ ছিলেন। মালিকের ইচ্ছার বাস্তবায়ন হবেই হবে। তীব্র অসুস্থতার ফাঁকে সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা ও হযরত ওসমান যুন নুরাঈন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও প্রমুখ

সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে পরবর্তী খিলাফতের জন্য নাম প্রস্তাব করেন। এভাবে লাগাতার পনের দিন ধরে অসুস্থতার সঙ্গে মুকাবিলা করে ১৩ হিজরী সনে জুমাদাল ওখরা মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবার ৬৩ বছর বয়সে অস্থায়ী এ জগত থেকে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সায়্যিদুনা ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। স্বীয় ওসিয়ত মুতাবেক তাকে রাসূলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজায়ে আতহারের অতি নিকটে দাফন করা হয়। দুই বছর সাত মাসের কাছাকাছি ছিলো তাঁর খিলাফতকাল। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের কারণে সমগ্র মদীনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মুহতারাম পিতা হযরত আবু কুহাফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর বয়স ছিলো তখন ৯৭ বছর। তার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার প্রিয় সন্তান বিদায় নিয়েছে, এ অবস্থায় আপনার অনুভুতি কেমন? তিনি বললেন, এ যেনো মহা মুসীবত! তাকে আবার বলা হয়েছে, হযরত সিদ্দিকের পরে এই খিলাফতের দায়িত্ব কে সামাল দিবে? তিনি বললেন, হযরত ওমর। এ ঘটনার পর মাত্র ছয় মাস শেষান্তে হযরত আবু কুহাফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুও ইন্তিকাল করেন। কতইনা খোশ নছীবি! নিজে সাহাবী ছিলেন, পিতাও সাহাবী, তার সন্তানও সাহাবী এবং নাতিও সাহাবী। সাহাবাদের ইতিহাসে এটি বিরল সৌভাগ্য। অন্য কোন সাহাবার ক্ষেত্রে এমন সৌভাগ্যের নযির নেই।

দ্বিতীয়ত খলিফা হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর পর মর্যাদায় হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর অবস্থান। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর বংশধারা হলো- ওমর বিন খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল আযিয ইবনে রিমাহ ইবনে কুরত্ব ইবনে রযাখ ইবনে বাদি ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই। আমুল ফিল বা হস্তি সনের ১৩ বছর পরে তিনি ভূমিষ্ট হন। (ইমাম নববী)। কুরাইশদের মধ্যে তিনি অত্যধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। যমানায়ে জাহেলিয়াতে তিনি দূতালি পদে কিংবা দূতাবাসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবু হাফস আর উপাধি ছিলো "ফারুক"। তিনি প্রথম সারির ইসলাম কবুল কারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার আলোকে তিনি চল্লিশ জন পুরুষ ও এগারজন মহিলা অথবা উনচল্লিশজন পুরুষ ও তেরজন মহিলা কিংবা পয়তাল্লিশজন পুরষ ও এগারোজন মহিলার পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম কবুল করবার কারণে ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যারপর নাই উচ্ছাস দেখা দিয়েছে। তিনি একাধারে প্রথম সারির সিনিয়র সাহাবা, আশরায়ে মুবাশশারাহ (জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত) এবং খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত।

মযার্দা ও ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণঃ

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে, হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা দোয়া করতেন যে, হে প্রতিপালক! ওমর বিন খাত্তাব এবং আবু জাহল বিন হিশামের মধ্য হতে তোমার কাছে যে অধিক প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করো। হযরত হাকেম (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসুলে পাক ছাহবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন "اللهم اعز الاسلام بعمربن الخطاب خاصة" হে আল্লাহ! বিশেষতঃ ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের শৌর্যবীর্য দান করো। রাসুলে পাকের দোয়া কবুল হলো। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নবুয়ত প্রকাশের ষষ্ঠ সনে ব্যক্তিগত ২৭ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন।

ইসলাম গ্রহণকালের ঘটনাঃ

হযরত আবু ইয়ালা, হযরত হাকেম ও ইমাম রায়হাকী রাহিমাহুমুল্লাহ সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর তরবারী হাতে বের হলেন। পথিমধ্যে বনী যাহরাহ গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়। লোকটি বললো, কোথায় চলেছেন? ওমর বললেন (হযরত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য বের হয়েছি। লোকটি বললো, তাঁকে হত্যা করে আপনি কি বনী যাহরাহ এবং বনী হাশেমের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন? হযরত ওমর বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমিও আমাদের পুর্বপুরুষের ধর্ম হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তাদের ধর্মে যোগ দিয়েছ। লোকটি বললো, হে ওমর! আপনাকে আমি এর চেয়েও আরো অবাক করা কিছু বলতে চাই! তা হলো, আপনার বোন ও বোনের স্বামী আপনার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে বিদ্যুৎ গতিতে হাযির হলেন। হযরত খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ঐ সময় ওখানেই উপস্থিত ছিলেন আর সকলে এক সঙ্গে "সুরা ত্বাহা" তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তারা হযরত ওমরের পদধ্বনি শুনতে পান, তখন একটি স্থানে লুকিয়ে গেলেন। হযরত ওমর সেখানে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে কী করছো? তারা বললেন আমরা পরস্পর কথা বলছিলাম। হযরত ওমর বললেন, আমার মনে হচ্ছে তোমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ! তখন ভগ্নপতি বলে উঠলেন হে ওমর! যদি তোমাদের ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সত্যের উপর হয়... এতটুকু বলতেই .... হযরত ওমর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অনেক মারধর করলেন। তাকে রক্ষা করার জন্য হযরত ওমরের বোন এগিয়ে আসলে তাকেও হযরত ওমর বেদম প্রহার করেন। এমনকি তাদের চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এরপরও নব্য এই ঈমানদারগণ বারবার বলেই যাচ্ছেন যে, হে ওমর! তোমার ঐ ধর্ম সত্য নয়। আমরা সাক্ষ্য

দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই ইবাদতের একমাত্র হকদার এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার বান্দাহ ও তারই প্রেরিত রাসুল। ইমানের এ অটলাবস্থা দেখে হযরত ওমরের হৃদয় খানিকটা বিগলিত হয়ে পড়ল। এবার তিনি বললেন, ঐ কিতাবটি কোথায়? আমাকে ওটা দাও! আমি তা পড়তে চাই! আমি এর তিলাওয়াত করতে চাই। তার বোন বললেন, হে ওমর! তুমি নাপাক, এ কিতাব স্পর্শ করোনা! এ পবিত্র কিতাবখানা তারাই ছুঁতে পারে, যারা পুতঃপবিত্র। যাও গোসল করো অথবা অযু করে আস। হযরত ওমর গিয়ে অযু করে আসলেন আর কুরআনে পাক খুললেন অতপর পড়তে লাগলেন।

طه مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى .... اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ
الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অনুবাদঃ হে মাহবুব আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন .... নিশ্চই আমিই হলাম “আল্লাহ”। আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

হযরত ওমর তেলাওয়াত করতে করতে এ পর্যন্ত যখন পৌছলেন, পুর্ণ বিগলিত হৃদয়ে বলে উঠলেন, চলো আমাকে হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে নিয়ে চলো। একথা শুনতেই হযরত খাববাব রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু আনহু গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, মোবারকবাদ হে ওমর!! মোবারকবাদ। আমার বিশ্বাস আপনিই রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দোয়ার ফসল। বৃহস্পতিবার নবীজি ফরিয়াদ করেছিলেন হে আল্লাহ! আপনি ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশামের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করো।

অতঃপর হযরত ওমর নবীজির দরবারে তাশরীফ আনেন। ঐ সময় হযরত হামযাহ ও হযরত তালহাহ সহ অন্যান্যরা দরজা সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত হামজাহ রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু আনহু হযরত ওমরকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, ঐ দেখ ওমর! যদি আল্লাহ পাক আজ তার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ করে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই ঈমান গ্রহণ করবেন। যদি তা না হয় তবে এখানেই তাকে কতল/হত্যা করা আমাদের জন্য সহজ হবে। এদিকে ঐ সময় হুজুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর ওহী নাযিল হচ্ছিলো। নবীজি বাইরে তশরীফ আনলেন। হযরত ওমরের কাপড় ও তলোয়ার বহনকারী বস্তুটি ধরে বললেন, হে ওমর! যদি তুমি আজ নিজেকে না সামলাতে তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর ঐ আযাব ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ করতেন যা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার উপর নাযিল করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই হযরত ওমর আরয করলেন- اشهدان لااله الا الله وانك عبد الله ورسوله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় আপনি আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসুল।

এবার হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যে মুহুর্তে কুরআনে পাক পড়া আরম্ভ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের আয়াত আমার উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে লাগল। আমি বললাম, কতইনা বদ নসীব কুরাইশদের! যারা এমন পবিত্র কিতাব থেকে দুরে সরে যায়? ইসলাম গ্রহণের পর নবীজির অনুমতিক্রমে দুটি কাতারে বিভক্ত হয়ে সাহাবায়ে কিরাম সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একটিতে ছিলেন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আর অন্যটিতে হযরত আমিরে হামযাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। নবুয়ত প্রকাশের পর এটি প্রথম দিন ছিলো, যে দিনটিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মুসলমানরা বীর বেশে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছে। মুসলমানদের এ বীরত্ব দেখে কুরাইশ কাফেরগণ অর্ন্তজ্বালায় দহন হতে লাগলো। সেদিন তারা অনেকটা বিব্রত ছিলো। অতঃপর ইসলামের প্রকাশ এবং হক্ব-বাতিলের পার্থক্য করণের মাধ্যমে হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে “ফারুক্ব” বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

আসমানবাসীদের উল্লাস

ইবনু মাজাহ ও হযরত হাকেম রাহিমাহুমাল্লাহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন হযরত জিব্রীল আমিন রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে হাযির হন। তিনি নবীজির কাছে আরয করেন, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম কবুলের কারণে আসমানবাসীও খুশি উদযাপন করছে। আনন্দিত হয়েছে। উল্লাস প্রকাশ করছে।

❖ ইবনে আসাকির (রাঃ) হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি যতদুর জানি হযরত ওমর ব্যতিত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে চুপে চুপে। তার পূর্ব ধর্ম ত্যাগের অবস্থা এমন ছিলো যে, ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারী সাথে নিয়ে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন। ঐ সময় কাফের সর্দারগণ কা'বায় অবস্থান করছিলো। হযরত ওমর সাত চক্কর তাওয়াফ করে নিলেন। মকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অত:পর কুরাইশের একটি দলের কাছে এসে ধমক দিয়ে বললেন, যদি কেউ প্রস্তুত থাকো যে, মাকে কাঁদাবে, সন্তানকে ইয়াতিম বানাবে, স্ত্রীকে বিধবা বানাবে

তবে সে যেনো আমার সঙ্গে মোকাবিলা করে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এমন হুংকার শুনে সুনসান নিরবতার সৃষ্টি হলো। কাফিরদের মধ্য হতে কেউই তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পর্যন্ত দেখাল না।

ফযীলত/ মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে যেগুলোতে তার অনেক বড় বড় মর্যাদার কথা বিবৃত হয়েছে।

- তিরমীযি ও মুসতাদরাকে এসেছে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যদি আমার পরে নবী আগমনের সম্ভাবনা থাকতো তবে হযরত ওমর বিন খাত্তাবই নবী হতো। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে হযরত ওমরের মর্যাদা, উচ্চতা, অবস্থান ও সম্মান সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়।
- ইবনে আসাকির (রঃ)'র এক হাদীসে বিবৃত আছে, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আসমানের সকল ফিরিশতা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মান করেন আর যমীনের প্রত্যেক শয়তান তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।
- ইমাম তাবরানী (রঃ) "আউসাত" গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হযরত ওমরকে ঘৃণা করবে বস্তুত পক্ষে সে আমাকেই ঘৃণা করলো আর যে ব্যক্তি হযরত ওমরকে প্রিয় জানলো প্রকৃত অর্থে সে আমাকেই মাহবুব বা প্রিয় জানলো।
- ইমাম তাবরানী ও হযরত হাকেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি হযরত ওমরের ইলমকে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অপর পাল্লায় পৃথিবীর সমস্ত জীবিত মানুষের ইলম রাখা হয়, তবে অবশ্যই হযরত ওমরের জ্ঞানের পাল্লা অধিকতর ভারী হবে।
- হযরত আবু উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা কি জানো আবু বকর ও ওমর কে? তারা হলেন ইসলামের বাবা ও মা।
- হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে মন্দভাবে উপস্থাপন করে।

হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র কারামাত

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযারাতে সাহাবায়ে কিরামগণ নবী বা রাসুল নন। সাহাবা হিসেবে তাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! তাদের কাছে নবুয়তের মহা নিয়ামত না থাকলেও বিলায়তের মকামে তারা সমূহ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রয়েছে অগণিত কারামাতও। আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও আপাদমস্তক কারামাত সমৃদ্ধ ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো-

- ইমাম বায়হাকী এবং আবু নুয়াইম (রাঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসিন নির্ভরযোগ্য পন্থায় বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খুতবার মধ্যখানে তিনবার يا سارية الجبل ইয়া সারিয়াতু আল জাবাল! বলে আওয়াজ দিলেন। উপস্থিত সকলে অবাক হলেন আর বলতে লাগলেন খুতবার মাঝখানে হঠাৎ এ বাক্য কেনো? পরবর্তীতে তার কাছে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, মুলকে আজমে 'নাহাওয়ান্দ' নামক স্থানে মুসলিম সৈন্যবাহিনী কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত রয়েছে। আমি এখান থেকে দেখতে পেলাম, কাফিররা উভয় দিক থেকে ঘিরে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় আমি আওয়াজ দিলাম "ইয়া সারিয়াতু আল জাবাল" হে সারিয়াহ! পাহাড়ের সাহায্য নাও। এ ঘটনার পর থেকে সকলে অপেক্ষমান ছিলো যদি সৈন্য বাহিনী থেকে কোন সংবাদ আসে তাহলে এর বিস্তারিত জিজ্ঞেস করা হবে। কিছুদিন পর এক পত্র বাহককে চিঠি সহকারে মদীনায় পাঠানো হল। সে চিঠিতে লেখা হয়েছে, জুমাআর দিন শত্রুদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিলো, বিশেষ করে একেবারে জুমুআর সময় হঠাৎ অদৃশ্য থেকে শুনতে পেলাম "ইয়া সারিয়াতু আল জাবাল" এটা শুনে আমরা কৌশল পরিবর্তন করে পাহাড়ের সাথে মিশে গেলাম অর্থ্যাৎ পাহাড়কে আমাদের আত্মগোপনের জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলাম। অদৃশ্য থেকে আসা এ আওয়াজের অনুসরন করার কারণে সে দিন দুশমনের উপর আমাদের বিজয় হাসিল হয়েছে। এমনকি শত্রুপক্ষ সেদিন লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ! ইসলামের মহান খলিফার অলৌকিক দূরদৃষ্টি মদীনায়ে তাইয়্যিবাহ থেকে "নাহাওয়ান্দ" নামক অঞ্চলে মুসলিম লশকর বাহিনীর উপর গিয়ে পৌছলো আর মদীনাহ থেকে আওয়ায দিলে তা ওখানে গিয়ে লশকর বাহিনীর কর্ণপাত হয়। না ছিলো কোন দুরবীন! না ছিলো কোন টেলিফোন। নিঃসন্দেহে এ অলৌকিকত্ব রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্ভেজাল গোলামীর সাদক্বাহ।
- হযরত আবুল কাসিম স্বীয় কিতাব 'ফওয়ায়িদে' বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তি আসলো। হযরত ওমর তার নাম জিজ্ঞেস করলেন সে বললো আমার নাম جمرة 'জামারাহ' যার বাংলা অর্থ হলো জ্বলন্ত অঙ্গার। হযরত ওমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার সন্তান? লোকটি বললো ابن شهاب 'ইবনে শিহাব' বা অগ্নিশিখার পুত্র। হযরত

ওমর বললেন কোন গোত্রের? লোকটি বললো حرقة 'হারাক্বাহ' গোত্রের। যার মানে হলো প্রজ্জ্বলিত বা দগ্ধ। আমিরুল মুমিনিন বললেন, তোমার মাতৃভূমি কোথায়? লোকটি বললো حرة হাররাহ যার অর্থ অতিগরম। এবার বললেন সেটি কোথায়? লোকটি বললো ذات نطى 'যাতু নাতা' এর অর্থ হলে আগুনের স্পুলিঙ্গ। অবশেষে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু বললেন, যাও নিজের পরিবারের খবর নিয়ে দেখ সবাই দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। লোকটি ফিরে গিয়ে দেখতে পেল সত্যিই সমস্ত খান্দান আগুনে জ্বলে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

◆ হযরত আবুশ শায়খ (রঃ) কিতাবুল ইসমাতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মিশর জয় হলো তখন একদিন মিশরবাসী হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসে। তারা আরয করে যে হে আমীরুল মুমিনিন! আমাদের নীলনদের একটা রসম বা নিয়ম রয়েছে। যতক্ষন না সে নিয়ম আদায় করছি ততক্ষণ এর পানি প্রবাহিত হবে না। হযরত ইবনে আস বললেন কী সে নিয়ম? তারা বললো এ মাসের এগারো তারিখ একজন কুমারীকে তার মা-বাবার কাছ থেকে এনে উত্তম পোষাক এবং অলংকারাবৃত করে সাজসজ্জা সহকারে নীলনদে প্রেরণ করতে হবে। হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কাজ কখনোই হতে পারে না। ইসলামে এ কাজের কোন স্থান নেই। ইসলাম এ জাতীয় কুসংস্কার দুমড়ে মুচড়ে দেয়। অতঃপর সে পুরানো পদ্ধতি মওকুফ করে দেয়া হলো। নদীর প্রবাহও কমতে শুরু করলো। এমনকি মানুষ সেখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করলো। এমন বেহাল পরিস্থিতি দেখে হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে হযরত ওরম বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রত্যুত্তরে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখে পাঠালেন হে আমর! তুমি ঠিকই বলেছ। ইসলাম এমন কুসংস্কারকে ধ্বংস করার জন্যই এসেছে। আমার এ চিঠির ভিতরে একটি "ছিরকোট" বা কাগজের টুকরা রয়েছে । তুমি সে টুকরাটি নীলনদে প্রেরণ করবে। হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন সে চিঠিখানা এসে পৌছলো। তিনি চিঠি থেকে সে টুকরাটি বের করলেন। সেখানে লেখা ছিল

از جانب بندۂ خدا عمر امیر المؤمنین بسوی نیل مصر بعد از حمد و صلوۃ آنکہ

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাহ আমিরুল মুমিনিন ওমরের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদ বরাবর। মহান আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর দরুদ সালামের পর.....হে নীলনদ। যদি তুমি নিজ থেকে বা নিজ ক্ষমতাবলে প্রবাহিত হয়ে থাকো তবে আর জারি হবার প্রয়োজন নেই আর যদি আল্লাহ পাক তোমাকে জারি করে থাকেন তবে সে একক পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবো তিনি যেনো তোমাকে জারী করে দেন। আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাগজের সে টুকরাটি নীলনদে ঢেলে দিলেন আর দেখা গেল এক রাত্রেই ষোলগজ পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব সে দিন থেকে কুমারী বিসর্জনের কুপ্রথা মিশর থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তপস্যা, খোদাভীতি, বিনয় ও সহনশীলতাঃ

◆ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দৈনন্দিন এগারো লুকমার (গ্রাস) চেয়ে বেশী খাবার গ্রহণ করতেন না।

◆ হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখেছি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জামা মুবারকের দু'পাশের মাঝখানে চারটি জোড়াতালি লাগানো ছিলো।

◆ এমনও বর্ণনা আছে যে, যখন শামের রাজ্য সমূহ বিজয় হলো, হযরত ফারুকে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সে রাজ্যসমূহে স্বীয় কদম স্পর্শ দ্বারা ধন্য করলেন। ঐ সময় রাজ্যের আমীর গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরতের অভিবাদনের জন্য এগিয়ে আসেন। আমিরুল মুমিনিন নিজের ব্যবহৃত বাহন উঠের উপর আরোহন করেন। হযরতের বিশেষ খাদেমগণ আরয করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আপনার অভ্যর্থনার জন্য শামের প্রসিদ্ধ গণ্যমান্যরা এগিয়ে আসছে। উচিত হবে আপনি ঘোড়ার উপর আরোহন করবেন। যাতে আপনার শৌর্যবীর্যে তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে। হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এমন ধারনা পোষন করো না। কারণ কাম বানানো ওয়ালা অন্য কেউ এ কাজে আমার কোন কৃতিত্ব নেই! সুবহানাল্লাহ।

◆ একদা রোম সম্রাটের একজন দূত মদীনায়ে তৈয়্যবাহতে আসে। এসেই আমিরুল মুমিনিনকে তালাশ করে। উদ্দেশ্য ছিলো রোম সম্রাটের পাঠানো পয়গাম (বার্তা) হযরতের খিদমাতে আরয করবে। তাকে বলা হলো আমিরুল মুমিনিন এখন মসজিদে অবস্থান করছেন। লোকটি মসজিদে আসলো। অতঃপর দেখতে পেলো এক ব্যক্তি মোটা জোড়াতালি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইটের উপর মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে লোকটি মসজিদ হতে বের হয়ে পড়ে। পুনরায় সে জানতে চাইলো আমিরুল মুমিনিন বা মুমিনগণের বাদশা কোথায়? লোকেরা বললো, কেনো মসজিদে কি তিনি তাশরীফ রাখেননি? লোকটি বললো, মসজিদে একজন দরবেশ ব্যতিত আর কাউকে দেখিনি। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঐ ফকীর-দরবেশই হলো আমাদের আমীর। ইসলামের খলিফা।

بر در میکدہ رندان قلندر باشند + کہ ستانند و دہند افسر شاہنشاہی
خشت زیر سر و بر تارک ہفت اختر پائی + دست قدرت نگر و منصب صاحب جاہی

কাব্যানুবাদ:
সম্মুখে শরাবখানা বে-পরওয়া দরবেশ
মাথায় বাদশাহী মুকুট যার নেই কোন ক্লেশ।
ইটের বালিশ মাথায়, সীঁথিতে সাত তারা
হাতে তার কুদরতের নগর, সিংহাসন দিলআরা।

রোম সম্রাটের প্রতিনিধি পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করে। গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমিরুল মুমিনিন'র চেহরা মুবারক ভাল করে দেখতে থাকে। অতপর হযরত ওমরের হক্কানিয়্যাতের ঝলক তার হৃদয়ে রেখাপাত করে।

مہر و ہیبت ہست ضد یک دگر + ایں دو ضد را جمع دید اندر جگر
گفت با خود من شہاں را دیدہ ام + گرد سلطاں راہمہ گردیدہ ام
از شہانم ہیبت و ترسے نبود + ہیبت ایں مرد ہوشم در ربود
رفتہ ام در بیشہ شیر و پلنگ + روئے من زیشاں نگرداند رنگ
بس شدم اندر مصاف کارزار + ہم چو شیر آں دم کہ باشد کارزار
بسکہ خوردم بس زدم زخم گراں + دل قوی تر بودہ ام از دیگراں
بے سلاح ایں مرد خفتہ بر زمیں + من بہفت اندازم لرزاں انچنیں
ہیبت حق ست ایں از خلق نیست + ہیبت ایں مرد صاحب دلق نیست

বঙ্গানুবাদ: হৃদয়ে ভালোবাসা ও ভয় যিদ পরস্পর
ভিন্ন ঐ দুই বস্তু এক দিলে একাকার।
বলে সে, দেখেছি বহু রাজাধিরাজ এ ভবে
বেষ্টিত সুলতান চারপাশ ঘিরে নিরাপদ তবে।
আমার কায়সারে নেই ভয় নেই কোন ভীতি
এ রাজা দেখে উধাও হিস হুশের হয়েছে ইতি।
দেখেছি অনেক হিংস্রপ্রাণী দেখেছি কতো বাঘ
এ মহান আত্মার ভুষণ দেখে হই শুধু হতবাক।
এবার তারে হত্যা করার ইচ্ছা হলো মোর
হঠাৎ করে বাঘে যেমন আক্রমন চালায় জোর।
গ্রাস করে নিবো তারে মারবো সীমাহীন
অন্যের মতো আঘাত করবো হবো হৃদয়হীন।
কিন্তু! ভয়ে আমি কাঁপি শুধু দাঁড়িয়ে থরথর

ঐ দেখো রক্ষীহীন হালতের সুলতান- ঘুমায় নিথর।
এই ভয় এ ভীতি নয় কারো, স্রষ্টারই দান
ছেঁড়া পোষাকের লোকটি তাই চির অম্লান।

◆ হযরত আমমার ইবনে রবীয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিদমাতে হাযির ছিলাম। যখন তিনি দৃঢ় নিয়তে হজ্বের উদ্দেশ্যে মদীনা তৈয়্যবাহ থেকে রওয়ানা হলেন। আসা-যাওয়ার পথে আমীর খলিফাদের ন্যায় তার বিশ্রামের জন্য কোন তাবু স্থাপন করা হয়নি। চলন্ত পথে যখনি রাত নেমে আসতো নিজের পরিহিত কাপড় ও চাদর কোন গাছের উপর ঢেলে আবৃত করে নিতেন । একদিন মিম্বারে আরোহন করে নসীহত ফরমাচ্ছিলেন, মোহরানা সম্পর্কে আলোচনা চলছিলো। এরই মাঝে তিনি বলে উঠলেন, কোন অবস্থায় যেনো মুহরকে মহার্ঘ (ভারী) করা না হয়। চল্লিশ আওকিয়া থেকে বেশী নির্ধারণ করা না হয়। (এক আওকিয়া=৪০ দিরহাম)। কেননা সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বীয় বিবিগণের মুহরকে চল্লিশ আওকিয়া থেকে বৃদ্ধি করেননি। অতএব আজকের তারিখ থেকে যে কেউ এর চেয়ে বেশী মুহর নির্ধারণ করবে, অতিরিক্ত সে অর্থ বায়তুল মালে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। হঠাৎ মহিলাদের কাতার হতে এক দূর্বল মহিলা দাঁড়িয়ে গেল আর বলে উঠল, হে আমিরুল মুমিনিন! এমন করে বলাটা আপনার মর্যাদার সাথে বেমানান। "মুহর" আল্লাহ প্রদত্ত স্ত্রীদের অধিকার। এটি মহিলাদের জন্য বৈধ। কি করে এর অংশ বায়তুল মালে নেয়া যেতে পারে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- ماٰتیتم احداهن قنطار فلا تاخذوا منه شیا

এবং তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়েও থাকো তবে তা থেকে কিছু ফেরত নিওনা।

একথা শুনার পর হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিনা দ্বিধায় অতিদ্রুত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন- امراة اصابت ورجل اخطا মহিলাটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছে আর পুরুষটি ভুল করেছে। পুনরায় মিম্বারে আরোহন করলেন আর ঘোষণা দিলেন যে, এ মহিলাটি সঠিক বলেছে। ভুল আমারই ছিলো। যা চাও মুহর নির্ধারণ করো। তিনি এবার ফরিয়াদ করলেন- اللهم اعفرلی کل انسان افقة من عمر হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো। প্রত্যেক ইনসান ওমর হতে বেশী বুঝে। সুবহানাল্লাহ! বিবেকের কী সৌভাগ্য! বিনয়ের কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সে দিন।

খিলাফত:
১৩ হিজরী সনের জুমাদাল ওখরা মাসে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের আসনে আরোহন করেন। ১০ বছর খিলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করেন। এ দশটি বছর বিশ্ব সুলতানদেরকে আজও হয়রান করে তোলে।

তার সময়ে পৃথিবী ইনসাফের রাজ্যে রূপ নেয়। বিশ্বে সত্য ও আমানতদারীর কানুন স্থাপন হয়। মাখলুকে খোদার চিত্তে পয়দা হয়েছে ন্যায়-নিষ্ঠা, সচ্ছতা ও জজবাহ্। ইসলামের বারাকাতে বিশ্ব অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে। তার সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়গুলো এত অধিক হারে ছিলো যে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের হর্তা-কর্তারা হতবাক- হয়ে চলেছে। পৃথিবীর যেদিকেই তাঁর সৈন্যবাহিনী পদচারনা করেছে, অমনিতেই বিজয় তাদের কদমধুলি নিয়েছে। বড় বড় প্রভাবশালীর ও রাজ্যপতিদেন মাথার মুকুট তার কদম মোবারকে ঝুঁকে পড়েছে। রাজ্য ও রাজ্যশহরে বিজয় এতো অধিক হারে অর্জন হয়েছে যে, তার তালিকা যদি লেখা হয় তবে তা বিরাট কলেবরে পরিণত হবে। তার ভীতি সঞ্চারণার অবস্থা এমন ছিলো যে, তার নাম শুনামাত্রই বীর বাহাদুরের বিষ পানিতে পরিনত হতো। যুদ্ধ অন্বেষণকারী অধিপতিগণ তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। সালতানাতের হুংকার চুড়নে ওয়ালারা তার ভয়ে প্রকম্পিত থাকত। এতদসত্বেও অর্থাৎ অনন্য স্বত্বা, ভীতি সঞ্চারক ও বহুগুনের সমাবেশ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবেশানা যিন্দেগীতে কোন প্রকার পার্থক্য আনতে পারেনি। রাত-দিন মহান আল্লাহর ভয়ে কান্নাজড়িত থাকতেন। এমনকি অধিক মুখায়বয়বে তার নিশান পড়ে গিয়েছিলো।

তার শাসনামলে আরবী হিজরী সন চালু হয়। সরকারী কোষাগার বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা হয়। তিনিই সমগ্র রাজ্য ও শহরে জামাআত সহকারে তারাবীহর নামায প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার আমলে রাত্রিবেলায় চৌকিদার প্রথা চালু হয়। বিশ্বে চলমান এ প্রথা হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনন্য সৃজনশীলতা। পূর্বে এ বিষয়টি অজ্ঞাত ছিলো।

◆ ইবনে আসাকির (র) হযরত ইসমাঈল ইবনে যিয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী মুরতাদা কাররামাহুল্লাহু ওয়াজহুহুল কারীম মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মসজিদগুলো বাতির আলোতে ঝলমল করছিলো। এমন দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কবর (মাযার)কে আলোকিত করুন, যিনি আমাদের এ মসজিদগুলো আলোকিত করেছেন। উল্লেখ্য, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর পরিধি বৃদ্ধি করেন। তিনিই হিজায হতে কুখ্যাত ইয়াহুদীদেরকে বিতাড়িত করেন। ইসলামে তার পবিত্র স্বত্তার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশী, যা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিসে বিবৃত রয়েছে।

শাহাদাত

২৩ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে অগ্নিপুজারক আবু লু'লু'র হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যখম হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন- كان امر الله قدرا مقدورا অর্থাৎ

মহান আল্লাহর কাজ সুনির্ধারিত। তিনি আরো বলেছিলেন, প্রশংসা ঐ খোদার যিনি আমার মাউতকে কোন ইসলাম দাবীদার'র হতে নির্ধারণ করেননি। তার ওফাতের পর উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার অনুমতিক্রমে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজায়ে আকদাসের অভ্যন্তরের অতি সন্নিকটে হযরত ছিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পাশেই তাকে দাফন করা হয়। খিলাফতের দায়িত্ব নির্ধারণকে তিনি মজলিশে শুরার উপর ছেড়ে দেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, ওফাতের সময় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। তার আংটি মোবারকে খুদাই করা নকশাতে লিখা ছিলো–
"كفى بالموت واعظا" মৃত্যুই নছিহত হিসেবে যথেষ্ট ।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বংশধারা হলো ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবু আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব। হস্তিসনের ষষ্ঠ বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুই তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি দুইবার হিজরত করেছেন। প্রথমবার মক্কা থেকে হাবশায়। দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে মদীনা তাইয়্যেবায়। তার যুগল জীবনে হুযুরে পাক, সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দু'জন সাহিবযাদীর আগমন ঘটে। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেই তাদের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বদর যুদ্ধের সময় অসুস্থ অবস্থায় হযরত রুক্বাইয়া (রাঃ) ওফাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঐ সময় তার সেবা-শশ্রুষা করবার জন্য তিনি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সম্মতিতে মদীনাহ তাইয়্যেবায় থেকে যান। ফলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হযরত ওসমানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা সত্তেও প্রিয় নবী আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বদর যুদ্ধে লব্ধ গণীমতের অংশ ও প্রাপ্ত প্রতিদান তার জন্য বহাল রেখেছেন। এ কারণে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে “বদরী সাহাবীদের” মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় হবার সংবাদ যে দিন এসে পৌছায়, ঐ দিনই নবী তনয়া হযরত রুক্বাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করা হয়। অতঃপর প্রিয় নবীজি তার অন্য সাহিবযাদী হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিয়ে দেন। তার ওফাত হয়েছিলো হিজরী ৯সনে। উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ব্যতিত পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যার দাম্পত্য জীবনে কোন নবী নিজের দু'জন সাহিবযাদীকে নিকাহ দিয়েছেন। এ জন্য তাকে ذو النورين যুন নুরাইন বা দুই নুরের অধিকারী বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন প্রথম সারির

সাহাবী, প্রথম সারির মুহাজির এবং আশারায়ে মুবাশশারাহ'র অন্তর্ভুক্ত আর তিনি সকল সাহাবাদের মাঝে অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যাকে আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন সংকলন করার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং এ কাজে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

◆ হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হযরত ওসমান ঐ সত্ত্বা, যাকে ফিরিশতাগণ যুন নুরাইন বলে আহ্বান করে থাকে।

মাতার দিক থেকে হযরত ওসমানের বংশধারা

হযরত ওসমান যুন নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাতার নাম হলো আরদা বিনতে কুরাইয বিনে হাসীব ইবনে আবদে শামস। তার নানী উম্মে হাকীম বায়দ্বা বিনতে মুত্তালিব ইবনে হাশিম। যিনি হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মুহতারাম পিতা হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এক সময়ে ভূমিষ্ট হন। এছাড়া হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিত মাতা হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফুফাতো বোন হন। তিনি ছিলেন খুবই সুন্দর সুশ্রী ও গুণবতী।

ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের উপর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ইসতিক্বামাত বা অটলাবস্থাঃ

◆ বর্ণনায় এসেছে, হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম কবুল করলেন তখন তার চাচা হাকিম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া তাকে ধরে এনে বেঁধে রাখে এবং বললো যে, তুমি বাপ-দাদার ধর্মত্যাগ করে একটি নতুন ধর্মকে গ্রহণ করেছো। খোদার কসম! আমি তোমাকে ছেড়ে দেবোনা যতক্ষণ না তুমি ঐ ধর্ম ত্যাগ করেছ। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তবে শোন আমিও বলছি আল্লাহর কসম! আমি ইসলামকে কখনোই ছেড়ে দেবোনা এবং এ দ্বীন থেকে কোন অবস্থায় পৃথক হবো না। শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমানের যবরদস্ত স্বনির্ভরতা দেখে তার চাচা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ফযীলত/ মর্যাদা

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন, "কামিলুল হায়া" বা পরিপূর্ণ লজ্জাবোধ সম্পন্ন সত্তা। বর্ণিত আছে যে, যখনি তিনি দরবারে রিসালাতে হাযির হতেন, হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় লিবাস (কাপড়) মুবারক উত্তম ভাবে ঠিক করে নিতেন। নবীজী বলতেন, আমি নবী ঐ ব্যক্তি থেকে কেনইবা লজ্জাবোধ করবো না যার ব্যাপারে স্বয়ং ফারিশতারাও লজ্জাবোধ করে।

◆ তিরমিযী শরীফে এসেছে, ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ আনহু হযরত আবদুর রহমান ইবনে খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমাতে হাযির ছিলাম। এ সময় নবীজি জায়শে ওসরাত (তাবুক যুদ্ধ)'র জন্য সাহাবায়ে কিরামকে উৎসাহিত করছিলেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একশো উট আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করবো। অতপর নবীজী আবারো সাহাবীদের উৎসাহ প্রদান আরম্ভ করলেন। হযরত ওসমান এবার বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি দুইশো উট পাথেয় সহ আপনার কদমে হাযির করবো। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পুনরায় তার উৎসাহ প্রদানের কাজ শুরু করলেন। হযরত ওসমান এবার আরয করলেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আমি সামানসহ তিনশোটি উট আপনার কদমে উৎসর্গ করবো। হুযুরে পুনপুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবার মিম্বার শরীফ থেকে নীচে নেমে আসলেন আর ঘোষণা করলেন, আজকের পরে ওসমানের উপর কোন কিছুই বাকি রইল না। অর্থাৎ ওসমানের এ ত্যাগ এমন উঁচু আর মাকবুল হয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য ও সর্বোচ্চ দরজাহ হাসিলের জন্য অতিরিক্ত (নফল) আর কিছু না করলেও যথেষ্ট হবে। এমন কুরবানীর পর হযরত ওসমান ক্ষতিগ্রস্থ হবার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। প্রিয় নবীর এ বাক্যগুলোর আলোকে বুঝা যায় দরবারে রিসালাতে হযরত ওসমানের মাক্ববুলিয়াতের মর্যাদা কতটুকু। সুবহানাল্লাহ।

◆ বায়আতে রিদওয়ানের সময় হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন না। আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাকে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন। তাই বায়আতের মুহুর্তে হযরত ওসমান যুন নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে নবীজি আলাইহিস সালাম নিজের একখানা হাত মোবারককে প্রশস্ত করে দিয়ে বললেন, ওসমান এ মুহুর্তে আল্লাহ ও রাসুলের কাজে ব্যস্ত আছে। তার পক্ষ হতে আমার এ হাত বায়আত গ্রহণ করছে। নিঃসন্দেহে বায়আতের এ শান হযরত ওসমানের সম্মান, মর্যাদা ও বিশেষ নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ। এছাড়াও তার মর্যাদার ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বিবৃত আছে।

খিলাফত

আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় যুগের শেষের দিকে সাহাবাদের একটি দল নির্ধারণ করেন। দলটির রুকন ছিলেন হযরত ওসমান গণী,

হযরত আলী মুরতাদা, হযরত ত্বালহা, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। পরবর্তী খলিফা নির্ধারণের দায়িত্ব শু'রা'র উপর ছেড়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একাকী হালতে হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যদি আমি আপনার বায়াত না নেই তবে আপনার সিদ্ধান্ত কার দিকে? তিনি বললেন, হযরত আলীর দিকে। একইভাবে তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেও জিজ্ঞেস করলেন। আর হযরত আলী হযরত ওসমানের কথা বললেন। ঠিক একইভাবে হযরত যুবাইর থেকেও জানতে চেয়েছেন, হযরত যুবাইর হযরত আলী অথবা হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহুকে বললেন, হে সা'দ তুমিতো খিলাফত চাওনা। এখন বলো কার ব্যাপারে তুমি রায় দিবে? তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করেন। হযরত আবদুর রহমান এবার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সাথে পরামর্শ করেন। সিংহভাগ রায় হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে আসে। সবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওসমান যুন নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন বা মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হলেন। আমিরুল মুমিমিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দাফনের তিন দিন পর তার পবিত্র হাতে বায়আত নেয়া হয়।

রাজ্য বিস্তার ও বহুমুখী উন্নয়ন

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে রায় ও রোমের বেশ কিছু কিলআহ জয় করেন। এছাড়া সাবুর, আরজান, দারে বজরদ, আফ্রিকা, স্পেন, কুবরাস, জুর, খোরাসানের বহু নগরী এবং নিশাপুর, তাউস, সারখস, মুরাদ এবং বায়হাক্ব জয় করেন। ফলে ইসলামী বিশ্বের বিস্তৃতি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হিজরী ২৬ সনে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে হারাম বা কা'বায়ে মুকাদ্দাসার সম্প্রসারণ করেন এবং হিজরী ২৯ সনে মসজিদে নববীরও সম্প্রসারন করেন। যা নকশাখচিত পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পাথরের তৈরি স্তম্ভও স্থাপন করেন। 'ছাল' (এক প্রকার গাছ যার কাঠ দিয়ে তখত বানানো হয়)'র কাঠ দিয়ে ছাদ নির্মাণ করেন। যার দৈর্ঘ্য ছিলো ১৬০ গজ এবং প্রস্থ ছিলো ১৫০ গজ। দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের বহুমুখী দায়িত্ব পালনের পর হিজরী ৩৫ সনে তিনি শাহাদাতের মকাম লাভে ধন্য হন।

দস্তে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার) প্রতি উপমাহীন তাযীম বা শ্রদ্ধা

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অবাধ্যরা যখন তার মহলকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে মোকাবেলার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন শক্তি-সামর্থ্যও ওসমানের পক্ষে জোরদার ছিলো। তা সত্ত্বেও তিনি সে আহবান কবুল করলেন না। অতঃপর নাফরমানদের পক্ষ হতে পুনরায় বলা হয় যে, মক্কায়ে মুকাররমা কিংবা অন্য কোন স্থানে আসুন। সেখানেই মুকাবিলা হবে। এ পর্যায়েও তিনি রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নৈকট্য ছাড়তে সামর্থ্য রাখিনা। সে দুঃসাহস আমার নেই। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ সত্তা যিনি যেদিন থেকে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, সে দিন থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্য নিজের ডান হাত দ্বারা লজ্জা স্থান (শরমগাহ) স্পর্শ করেননি। কেননা ঐ হাততো প্রিয় নবীজির পবিত্র হাতে উৎসর্গ করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম গ্রহনের পর হতে এমন কোন জুমুআর দিন অতিবাহিত হয়নি, যে দিনটিতে তিনি কোন গোলাম মুক্ত করেননি। যদি কোন জুমুআতে তার নিকট কোন গোলাম না থাকতো তাহলে জুমুআর পরে হলেও আযাদ করতেন।

শাহাদাত:

আইয়্যামে তাশরীক্বের সময় হযরত ওসমানের শাহাদাত সংঘটিত হয়। শনিবার রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে জান্নাতুল বাকীতে তার দাফন সম্পন্ন হয়। তার যাহেরী হায়াতের মুদ্দত ছিলো ৮২ বছর। বিখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসিয়ত অনুসারে হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার দাফন কাফন সম্পন্ন করেন।

শত্রুদের পরিণাম

❖ ইবনে আসাকির (রঃ) ইয়াযিদ ইবনে হাবীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর হামালাকারীদের অধিকাংশই পরবর্তীতে পাগল (বিকৃত মস্তিস্ক) হয়ে গিয়েছে।

ফিতনার আবির্ভাব

❖ হযরত খুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করাটা ছিলো প্রথম ফিতনা। পৃথিবীর শেষ ফিতনা হবে দাজ্জালের আর্বিভাব হওয়ার মধ্যদিয়ে। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কারণে সাহাবায়ে কিরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এক আশ্চর্যজনক

গতির সঞ্চার হয়। যদিও তারা এ ঘটনায় শংকিত ছিলেন। আর ভাবতে লাগলেন যে, এর মাধ্যমে ইসলামে ফিতনার দরজা খোলে দেয়া হয়েছে।

- হযরত সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলাম এক শক্তিশালী কিলআয় রক্ষিত ছিলো। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত ইসলামের প্রথম ফিতনাহ এবং এটি এমন ফিতনাহ যার রোধ করা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব নয়।

- হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে নকল করা হয়েছে যে, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওখানে ছিলেন না। তিনি উষ্ট্রী যুদ্ধে বলেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হযরত ওসমানের হত্যার উপর আফসোস প্রকাশ করছি। যে দিন তাকে শহীদ করা হয় ঐ দিন আমি দিশাহারা হয়ে পড়ি। মানুষ দলে দলে আমার কাছে বায়আত গ্রহনের জন্য আসতে শুরু করে। আমি বললাম আল্লাহর কসম! আমি এমন জাতির বায়আত করতে লজ্জাবোধ করছি, যারা হযরত ওসমানকে শহীদ করেছে। মহান আল্লাহর নিকট আমি লজ্জিত যে, আমি হযরত ওসমানের দাফনের পূর্বে বায়আতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বো! অতঃপর এসব শুনে মানুষ ফিরে গেলো। কিছু পর.... তারা আবারো বায়াতের দরখাস্ত নিয়ে আসতে শুরু করলো, আমি বললাম হে আল্লাহ! আমি ঐ বিষয়ে শংকিত যা হযরত ওসমানের উপর ঘটেছে। কিন্তু সব শেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন হলো। আমাকে বায়আত করাতেই হলো। মানুষ যখন আমাকে "হে আমিরুল মুমিনিন" বলে সম্বোধন করা শুরু করলো, তখন এ শব্দগুলো আমার হৃদয়ে রেখাপাতের সৃষ্টি করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিপটে হযরত ওসমানের কথা স্মরণ এসে যায়। নিজের দিকে এ শব্দ গুলোর সম্বন্ধ দেয়া সত্যিই বেদনাদায়ক। একথা থেকে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অকৃত্তিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অথচ হযরত আলী চলমান সে হাঙ্গামা দমনের আপ্রাণ চেস্ট করেছিলেন। এমন কি স্বীয় দু'সাহিবযাদা হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরজায় তলোয়ার সহকারে হিফাজতের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ যা মানযুর করে রেখেছিলেন এবং যে ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অগ্রিম পয়গাম শুনিয়ে গেছেন তা কি কেউ হটাতে পারে?

চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী মুরতাদা
(কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহুহু)

নাম আলী। কুনিয়াত বা উপনাম আবু তুরাব। তাঁর সম্মানিত পিতা- হুযুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চাচা আবু তালিব। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যুবক অবস্থায় ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স কতো ছিলো এ বিষয়ে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় পনেরো, এক বর্ণনায় ষোল, এক বর্ণনায় আট এবং আরেক বর্ণনায় দশ। যদিও তার বয়স নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তদুপরি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, জীবনের প্রথম দিকেই তিনি ইমানের দৌলত হাসিলে ধন্য হয়েছেন, তিনিও হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতো কখনও মূর্তি পূজায় সম্পৃক্ত ছিলেন না। অন্যান্য খলিফাদের মতো তিনি আশরায়ে মুবাশশারাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদের ব্যাপারে জান্নাতের পূর্ব অঙ্গীকার রয়েছে। চাচাতো ভাই হওয়া ছাড়াও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে তার জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাছাড়া তিনি হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কলিজার টুকরা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত বতুলে যাহরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সনে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথম সারির আলিমে রাব্বানীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। অদম্য সাহসী বীর পুরুষ হিসেবে তিনি জগত প্রসিদ্ধ এক অনন্য স্বত্তা। আরব-অনারবে, জলে ও স্থলে শক্তিমান ও স্বকীয়তার তিনি তুলনাহীন। আজো তার প্রভাবে শের সাদৃশ্য বীর নওজাওয়ানের অন্তরে কম্পনের সৃষ্টি হয়। একইভাবে তপস্যা-সাধনার ভবে তিনি বিশ্বব্যাপী বিশেষ মকামে অধিষ্ঠিত আছেন। অগণিত আউলিয়ায়ে কিরাম তার নুরানী কলবের ভান্ডার হতে ধন্য হয়ে চলেছেন। তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনার দরুন পৃথিবী জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও রিয়াযতে ভরপুর হয়ে আছে। সুস্পষ্ট বয়ান দাতা এবং প্রসিদ্ধ বক্তা হিসেবেও তিনি উচুঁ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন সংকলনকারীদের তালিকায় তার নাম নুরানী অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বনী হাশেমের প্রথম খলিফা এবং তিনিই নবীজীর আদরের দৌহিত্র দ্বয় হাসানাঈন-জামীলাঈন (সুন্দরতম) সা'দাঈন (সৌভাগ্যবান) শহীদাঈন (শাহাদাত প্রাপ্ত)'র মুহতারাম জন্মদাতা পিতা।

সাআদাতে কিরাম সৈয়্যদ বংশ তথা আওলাদে রাসুলের সিলসিলাহ বা বংশধারা মহান আল্লাহর তার মাধ্যমেই জারী রেখেছেন। তাবুক ছাড়া ইসলামের পক্ষে সমূহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হাসিল করেন। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঐ যুদ্ধের সময় তাকে মদীনায় খলিফা নির্ধারণ করেন। আর ইরশাদ করেছেন হে আলী! আমার দরবারে তোমার জন্য ঐ মর্যাদা অবধারিত, যেমনটা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দরবারে হযরত হারুন আলাইহিস

সালামের জন্য ছিল। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বেশ কিছু অভিযানে হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়েছেন। বিশেষত: ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধে। নবীজী এও বলেছেন, আলীর হাতেই খায়বার বিজয় হবে। সেদিন খায়বার কিলআর দরজা স্বীয় পিটের উপর তিনি বহন করেন। মুসলিম বাহিনী তার উপর চড়েই সে কিলআহকে ফতেহ (বিজয়) করেছেন। অথচ যুদ্ধ শেষে সে দরজাটি বের করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চল্লিশজন সিপাহীর পক্ষে সে দরজা বহন করা সম্ভব হয়নি। সুবহানাল্লাহ। অদম্য সাহসিকতা আর বীরত্বের পাশে শক্তিধর মাওলা আলীকে বিশ্ব আজো সমীহের চোখে ভাবে। এমনি করে যুদ্ধ মাঠে হযরত শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শৌর্যবীর্য অমর হয়ে আছে।

আবু তুরাবে তৃপ্ত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

"আবু তুরাব" হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অতি প্রিয় একটি নাম। এ নামের রয়েছে ভালোবাসা ভরা প্রেক্ষাপট। একদিন মসজিদের দেয়াল ঘেষে শুয়ে রইলেন তিনি। পুশত (পিঠ) মুবারক ধুলো-বালিতে ছেঁয়ে গেছে। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেখানে তাশরীফ রাখেন। আর পিঠের ধুলো-বালি সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, হে আবু তুরাব! (মাটি ওয়ালা) বসে পড়ো। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু ফদ্বলি আলি ইবনে আবি তালিব)। নবীর পবিত্র যুবান নিঃসৃত এ নামটি হযরত আলীর কাছে খুবই প্রিয় মনে হতো। ঐ নাম থেকে তিনি হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার (লুতফু কারাম) দয়া-অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করতেন।

ফদ্বীলত/মর্যাদা

- হযরত সা'দুবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আহলে বায়তের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদীনায়ে তাইয়্যেবায় রেখে যান। এ প্রেক্ষিতে হযরত আলী নবীজীর কাছে আরয করলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি মহিলা ও শিশুদের জন্য আমাকে খলিফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ দিয়েছেন? নবীজী বললেন, হে আলী! তুমি কি এ কাজে অসন্তুষ্ট? অথচ আমার দরবার তোমার ঐ মর্যাদা সংরক্ষিত, যেমনটা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দরবারে হযরত হারুন আলাইহিস সালামের মর্যাদা রক্ষিত ছিলো। তদুপরি আমিই শেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী নেই।

- হযরত সাহল ইবনু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা খায়বারের দিন ইরশাদ করেন, আমি ঐ ব্যক্তির হাতে যুদ্ধ ঝান্ডা তুলে দেবো, যার হাতে আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজিত করবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলকে প্রিয় জানবে। তাকে আল্লাহ ও রাসুল প্রিয় জানবেন। হৃদয় উদ্বেলক এ শুভসংবাদ সাহাবায়ে কেরামকে সারারাত আকাঙ্খার প্রহর গুনার কাজে ব্যস্ত করে দিলো। আশান্বিত ঐ হৃদয়গুলোর পক্ষে রাত অতিবাহিত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। বীর মুজাহিদগণ সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। প্রতিটি হৃদয় এ মহান নি'মাত লাভের আশা করে যাচ্ছে। চক্ষু তাদের অপেক্ষমান এই আশায়- প্রভাত বিকিরণের সাথে সাথে না জানি সুলতানে দারাঈন বিজয়ের ঝান্ডা কার হাতে তুলে দেবেন। সকাল হতে না হতেই বুক ভরা আশা নিয়ে সকলে নবীজীর দরবারে হাজির হলেন আর আদব সহকারে দেখছিলেন, করুণাময় নবীজির পবিত্র হাত কাকে সৌভাগ্যবান করছে। কিন্তু মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ঠোঁট মোবারক পূর্ণ আরমানে কারো তালাশে কুরবান হতে চলেছে। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জিজ্ঞেস করলেন, সবাইকে দেখছি কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সাহাবাদের তরফ থেকে বলা হলো হুযুর! তিনি তো অসুস্থ! তার চোখে অসুখ এসেছে। নবীজি তাকে ডাকতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত আলী মুরতাদ্বা তাশরীফ আনলেন। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থুথু মোবারক লাগিয়ে তার চোখের চিকিৎসা করলেন এবং তার বারাকাতের জন্য দোয়া করলেন। মুহুর্তেই তার চোখের অসুস্থতা দুর হয়ে যায়। হযরত আলী এমন পূর্ণ সুস্থতা লাভ করলেন যে, এখন না আছে চোখের ব্যথা! না আছে লাল বর্ণ, না আছে ধুলো-বালি। তিনি আরাম অনুভব করতে লাগলেন। এমনকি সেদিন থেকে আর কোনদিন কোন অসুস্থতা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে স্পর্শ করতে পারেনি। অতঃপর হুযুরে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার হাতে সে কাঙ্খিত ঝান্ডা তুলে দিলেন।

- ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুমুল্লাহ হযরত হাবসী ইবনে জুহহাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। হুযুর সৈয়্যদ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আলী আমার থেকে আমি আলী থেকে। মানে আলি আমার আর আমি আলীর। এ থেকে বারেগাহে রিসালাতে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও সম্মান কতো বেশী তা পরিস্কার বুঝা যায়।

- ইমাম মুসলিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী মুরদাতা কাররামাল্লাহু ওয়াজহুহুল কারীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, শপথ ঐ স্বত্তার যিনি বীজকে উদ্ভাবন করেছেন আর তা থেকে উদ্ভিদ দান করেছেন এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। নিশ্চয় নবীকুল সর্দার আমাকে বলেছেন যে, ঈমানদারগণই আমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

◆ ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হযরত আলীর সাথে বিদ্বেষ রাখাই ছিল মুনাফিকের আলামত বা নিদর্শন। যা দ্বারা আমরা মুনাফিক চিহ্নিত করতাম।

◆ হযরত হাকেম রাহিমাহুল্লাহু আনহু হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে ইয়ামানের কাযী পদে নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করলেন! তখন আমি আরয করলাম হুযুর! আমি অল্প বয়সী। বিচার কার্য সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই। কিভাবে এ মহা দায়িত্ব আনজাম দেব? আপত্তি শুনে নবীজী স্বীয় হাত মোবারক আমার বুকে রাখলেন অতঃপর দোয়া করলেন। খোদার কসম! সেদিন হতে বিচার কার্য সম্পাদন করার মধ্যে আমার কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্ধ হয়নি। সিনিয়র সাহাবাগণ হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উত্তম বিচারক হিসেবে জানতেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফায়জের এমন অবস্থা যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সিনায় স্বীয় হাত মোবারক রাখার সাথে সাথেই পূর্ণ-বিচারজ্ঞান ও সমসাময়িকদের মাঝে অনন্যতা লাভ করলেন। অতএব সে হাত মোবারক স্পর্শে তার হৃদয় জ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হয়। সুতরাং নবীজীর ইলমের বর্ণনা কি দেয়া যায়? প্রকৃত অর্থে তা বর্ণনাতীত নয় বরং অসম্ভব।

◆ ইবনে আসাকির আলাইহির রাহমাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে বহু আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে।

◆ ইমাম তাবরানী ও ইমাম হাকেম আলাইহির রাহমাহ বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আলী মুরতাদ্বাকে দেখা ইবাদতের শামিল।

◆ হযরত আবু ইয়া'লা ও হযরত বাযযার হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিলো বস্তুত পক্ষে সে আমাকে কষ্ট দিলো।

◆ হযরত বাযযার ও হযরত হাকেম উভয়ে হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন। হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে বললেন, হে আলী! হযরত ইসা আইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে এক জায়গায় তোমার মিল রয়েছে। তা হলো, ইয়াহুদীরা তার প্রতি এতো বিদ্বেষ রাখতো শেষ পর্যন্ত তার সম্মানিত মাতাকে অপবাদ দিয়েছে। অন্যদিকে নাসারাগণ ভালোবাসার সীমালঙ্গন করে এমন পর্যায়ে পৌছল যে, শেষ পর্যন্ত তাকে খোদা হিসেবে বিশ্বাস করা শুরু করে দেয়।

এ জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাবধান হয়ে যাও! আমাকে ঘিরে দুটো দলের আবির্ভাব হবে। একটি দল আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসবে। এমনকি আমার মর্যাদাকে বুলন্দ করতে গিয়ে সীমালঙ্গন করে বসবে। দ্বিতীয়টি হবে বিদ্বেষ পোষণকারী যারা শত্রুতা বশত আমার উপর অপবাদ দিতে থাকবে।

হযরত আমিরুল মুমিনিনের ইরশাদ থেকে স্পষ্ট হলো যে, শিয়া ও খারেজী উভয় দলই পথভ্রষ্ট এবং ধ্বংসের দিকেই তাদের পথচলা। সঠিক পথ তথা সিরাতে মুসতাক্বিমের পথে আছে কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। যারা মুহাব্বত করে কিন্তু সীমালংঘন করেনা। সমূহ প্রশংসা কেবল আল্লাহরই নিমিত্তে।

বায়আত ও শাহাদাত

◆ ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনানুযায়ী হযরত আমিরুল মুমিনিন ওসমান গণী রাদ্বিল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর দ্বিতীয় দিন মদীনায়ে তাইয়্যেবায় অবস্থানরত সকল সাহাবী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়াআত কাজ সম্পন্ন করেন। ৩৬ হিজরী সনে জমল বা উষ্ট্রী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩৭ হিজরীর সফর মাসে সিফিফনের যুদ্ধ হয় যা একটি সুলেহ বা সন্ধির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়টিতে খারেজীরা অবাধ্য হয়ে উঠে এবং সৈন্য সমবেত করে হামলা চালায়। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে মুকাবিলার জন্যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খারেজীদের মোকাবেলায় বিজয় লাভ করেন এবং খারেজীদের বড় একটি অংশ প্রত্যাবর্তন করে। তারা পরবর্তীতে দ্বীনে হক্কের উপর অটল ছিলো বটে। কিন্তু "নাহরাওয়ান"র দিকে রওয়ানা হয়ে রাহাজানি ডাকাতির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হযরত আমিরুল মুমিনিন সৃষ্ট এ ফিতনা দমনের জন্য নিজেই নাহরাওয়ানের দিকে ছুটে গেলেন। ৩৮ হিজরী সনে তিনি সেখানেই তাদেরকে কতল করেন। এরা এমন ফিতনা যাদের আবির্ভাবের আগাম সংবাদ হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পূর্বেই দিয়ে রেখেছিলেন। খারেজীদের এক বদনসীব আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম। যে কিনা বারক ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী খারেজী এবং আমর তামিমী খারেজীকে মক্কা মুকাররমায় একত্রিত করে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী ও আমিরুল মুমিনিন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে হত্যার করার

পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। ইবনে মুলজাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং একটি তারিখও নির্ধারণ করে।

মুসতাদরাকে হযরত মুনযারি থেকে অথবা সাদি থেকে বর্ণিত আছে, ইবনে মুলজাম কিতাম নামের এক খারেজী মহিলার প্রতি আসক্ত ছিলো। ঐ হতভাগীর বিয়ের মোহর ছিলো তিন হাজার দিরহাম। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে শহীদ করে দেয়ার মত ঘৃন্য কাজকে যার বদলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বিখ্যাত আরবী কবি ফারাযদাক'র কবিতায় এসেছে.......

فلم ارمهرا اساقه ذوسماحة + كمهر قطام بين غير معجم
ثلثة الاف وعبد وقينة + وضرب على بالحسام المصمم
فلا مهرا على من على فان غلا+ ولا فتك الادون فتك ابن ملجم

অর্থাৎ- আমি কিতামের মুহরের মত সাধারণ শ্রেণীর জন্য এত উচ্চ বিলাসী কোন মুহর নির্ধারণ করতে কখনো দেখিনি। যার পরিমান তিন হাযার। আর তার বদলা হলো একজন গোলাম, একজন দাসী এবং হযরত আলীকে ধারালো তরবারী দিয়ে হত্যা করা। অতএব হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে উচ্চ মূল্যের মোহরানা আর কী হতে পারে? অনুরূপ ইবনে মুলজামের মত ঘাতক/দুর্বৃত্ত আর কে থাকতে পারে?

ইবনে মুলজাম কুফায় পৌছলো! সেখানে খারেজীদের সাথে দেখা করলো এবং তাদের নিকট তার নাপাক ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলো। খারেজীরা তার সাথে ঐক্যমতে পৌছে। জুমুআ রাত, ৪০ হিজরী সনে ১৭রমজান! আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাহারীর সময়ে জাগ্রত হন। ঐ রমজানে তার একটি নিয়ম ছিলো যে, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একরাত ইফতার করেছেন তো অন্য রাত হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইফতার করতেন এবং তার পরের রাত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইফতার করতেন। তিন গ্রাসের (লুকমা) বেশী তিনি ইফতার গ্রহন করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ পাকের সাথে যেদিন সাক্ষাত হয়, সেদিন আমার পেট খালি রাখাই উত্তম মনে করি। শাহাদাতের রাতটির অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি বার বার ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ রাখছিলেন আর ঘন ঘন আসমানের দিকে দেখছিলেন। তিনি বলছিলেন কসম খোদার! আমাকে মিথ্যা সংবাদ দেয়া হয়নি। এটিই সেই রাত, যে রাতের প্রতিশ্রুতি আমাকে দেয়া হয়েছে। অতঃপর যখন সকাল হয়, প্রিয় সন্তান আমিরুল মুমিমিন হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বললেন, হে হাসান! আজ রাতে হাবীবে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামার সাথে যিয়ারত হয়েছে। আমি আরয করেছি ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মত থেকে শান্তি পাইনি। নবীজী বললনে, তাদের জন্য বদ দোয়া করো (যারা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে) আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম হে আল্লাহ! এ যুলুমের পরিবর্তে আমাকে আরো উত্তম প্রতিদান নসীব করো আর তাদের হক্বে আমার স্থানে মন্দ বদলা দান করো।

আহলে বায়তে নবুওয়াত

এতক্ষণ পর্যন্ত হযারাতে খুলাফায়ে রাশেদীনের আলোকপাত করা হলো। যাদের পবিত্র সত্তাগুলো নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা রাখেন। প্রকৃত পক্ষে হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি যার ন্যূনতম মুহাব্বত ও হৃদ্যতা রয়েছে তার মর্যাদা ও মরতবা ধারণাতীত এবং অবর্ণনীয়। অতএব মদিনা শহরে বসবাসকারীগণ আকায়ে নামদার ছরকারে দৌলতে মাদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাথে নিসবাত বা সম্বন্ধিত ব্যক্তির মর্যাদার কি হালত হতে পারে সেটিই ভাববার বিষয়। হাদিস শরীফে বিবৃত আছে।

من اخاف اهل المدينة ظلما لخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين–

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মদিনাহ বাসীকে অন্যায় ভাবে ভয় দেখাবে, তার উপর আল্লাহ পাক ভীতি সঞ্চারণা করেন। মহান আল্লাহর ফারিশতা ও সমূহ মানুষের অভিশাম্পাত তার উপর নাযিল হয়।

- এই হাদীসটি কাযী আবু ইয়ালা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিরমীযি শরীফে হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

قال صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل فى شفاعتى ولم تنله مودتى–

(তিরমীযী, আবওয়ালু মানাক্বিব, বাবু ফাদ্বলিল আরব)

অনুবাদ : হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আরব বাসীর প্রতি ঘৃণা রাখবে সে আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং সে আমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌছতে পারবেনা।

আরবের বাসিন্দা হবার সুবাদে একজন মানুষকে এমন পর্যায়ে পৌছে দেয় যে, তার সাথে খিয়ানতকারী ব্যক্তি হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শাফাআত ও মুহাব্বাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতএব যে সকল পূণ্যাত্মা ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ সুউচ্চ দরবারে নৈকট্য অর্জন করেছেন এবং বিশেষত্ব হাসিল করেছেন না জানি তাদের মর্যাদা কতটুকু? এ থেকে আহলে বায়তের ফদ্বীলত অনুমান করা দরকার। যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত ও হাদীসে পাকে রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

অনুবাদ হে আহলে বায়ত! অবশ্যই এটি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যে, তোমাদের থেকে সকল নাপাকি দুর হয়ে যাক এবং তিনি তোমাদেরকে পুতঃপবিত্র করে পাক-সাফ করে দিবেন। (পারাঃ ২২, আয়াত-৩৩)

অধিকাংশ তাফসীর বিশারদদের এই সিদ্ধান্ত যে, এ আয়াত খানা হযরত আলী মুরতাদা, হযরত সায়্যিদাতুন নিসা ফাতিমাহ যাহারা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীনের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতের ইঙ্গিত হলো "عنكم" যার পরে যমীর বা সর্বনাম পুঃলিঙ্গ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ আয়াতখানা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র বিবিগণের শানে নাযিল হয়েছে। কেননা আয়াতটির পরপরই ইরশাদ হয়েছে واذكرن ما يتلى فى بيوتكن আর এ মতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিল্লাহু আনহুর দিকে নিসবাত দেয়া হয়েছে।

এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা স্বয়ং রাসুলে পাক, সাহেবে লওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মহান সত্তার গুণাবলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্যান্য মুফাসসিরিনদের মতে অত্র আয়াতটি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ব্যতীত তার সম্মানিত বিবিগণের ব্যাপারেও নাযিল হয়েছে। এর দলিল হলো واذكرن ما يتلى فى بيوتكن দ্বারা বিবিগণের ঘর বুঝানো হয়েছে।

নবীজীর আহলে বায়ত 'বংশ ও নৈকট্যতার' দিক থেকে এমন সত্তা, যাদের জন্য সদকাহ গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। এ কথার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃঢ়তা ও প্রাধান্য রয়েছে। ইবনে কাসীরও এ বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন।

হাদীসে পাকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাফসীর বিশারদদের দু'দলের মতামতের উপর মুহাদ্দিসদের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন.......

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াতটি পাঞ্জেতানে পাক'র শানে নাযিল হয়েছে। পাঞ্জেতান দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে তারা হলেন, হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, হযরত আলী মুরতাদা, হযরত ফাতিমাহ, হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

- একই বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে জারীর মারফু পর্যায়ের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবরানী (রাঃ) তাবরানী শরীফের হাদীসে বর্ণনা করেন। এছাড়া মুসলিম শরীফে এসেছে, হুযুরে আনওয়ার আলাইহিস সালাত ওয়াত তাসলিম উল্লেখিত হযারাতগণকে স্বীয় চাদর মুবারকে শামিল করে এ আয়াতখানা তিলাওয়াত করেছেন এবং একথাও বিশুদ্ধ পন্থায় প্রমাণিত যে, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামা তাদেরকে চাদর মোবারক শামিল করে এ দোয়া করেছেন,

اللهم هولآء اهل بيتى وخاصتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا-

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত-এরাই আমার বিশেষ ব্যক্তি/আপনজন। অতএব তাদের থেকে নাপাকি দুর করো এবং তাদেরকে পুতঃপবিত্র/ পাক-সাফ রাখ।

এ দোয়া শুনে উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন, وانا منهم হে আল্লাহর হাবীব! আমিও তাদের সঙ্গে আছি! নবীজী বললেন, انك على خير হে সালমাহ তুমি যে অবস্থায় আছো, কল্যানের উপর আছ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত উম্মে সালমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন بلى নিশ্চয়! অতপর তাকে চাদরে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওয়াছিলাহ আরয করেছেন হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্যও দোয়া করুন। তখন নবীজি তার জন্য দোয়া করলেন। বিশুদ্ধ আরেক রিওয়ায়াতে এসেছে, হযরত ওয়াছিলাহ আরয করেছিলেন। وانا من اهلك হে আল্লাহর হাবীব! আমিও আপনার আহলের অন্তর্ভুক্ত। নবীজী বললেন- وانت من اهلى হ্যা! তুমি আমার আহল বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ এসব কিছু রাসুলে পাকের প্রতি উৎসর্গিত ঐ একনিষ্টদের জন্য হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিশেষ দয়া। যাদেরকে তিনি নিজের আহল বা পরিবারের মধ্যে শামিল করেছেন। তবে এ অন্তর্ভুক্তি হবে হুকমী, হাক্বীক্বী নয়। কেননা অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অন্যান্য সাহিবাযাদা, নিকটাত্মীয় এবং সম্মানীতা বিবিগণকেও এ চাদরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ছা'লবীর মতে, আয়াতে উল্লেখিত আহলে বায়াত দ্বারা সমস্ত বনী হাশিমকে বুঝানো হয়েছে। নিম্মোক্ত হাদীসটি এই কথার প্রমাণ বহন করে। যেমন হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত আব্বাস ও তার আওলাদদেরকে চাদরে আবৃত করে নিয়ে দোয়া করেন।

يا رب هذا عمى وصنوا ابى هولاء اهل بيتى فاسترهم من النار كسترى اياهم بملئتى
هذه فامنت اسكفة الباب وحوائط البيت-

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ইনি (আব্বাস) আমার চাচা, আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত। এরা সকলেই আমার আহলে বায়াত। হে প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে এমনভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে গোপন করো যেমনটা আমি আমার চাদর মোবারকে গোপন করেছি। এ দোয়াটির প্রেক্ষিতে ঐ স্থানের সমূহ দরজা ও দেয়াল পর্যন্ত আমীন বলেছে।

মোদ্দা কথা হলো, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সঙ্গে বসবাসকারী সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারাই অত্র আয়াতের মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি। যদিও আহলে বায়াত দ্বারা বংশকে উদ্দেশ্য নেয়াটা অস্পষ্ট ছিলো। এ জন্য হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উল্লেখিত আমল দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে বায়ত দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো আম বা ব্যাপক। চাই তারা ঘরের বাসিন্দা হোক না কেন যেমন.... পবিত্র বিবিগন অথবা বংশীয় সূত্রে হোক! যেমন বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব।

❖ হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি ঐ আহলে বায়ত'র অন্তর্ভুক্ত, যাদের থেকে মহান আল্লাহ্ নাপাকি দুর করেছেন এবং যাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় পুত:পবিত্র করেছেন। অতএব অত্র হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আয়াতে নবীজির বংশকে ঠিক ততটুকু বুঝানো হয়েছে যতটুকু ঘরের বাসিন্দাকে বুঝানো হয়েছে। মুলতঃ এ আয়াতে কারীমাহ হলো আহলে বায়তে কিরামের ফদ্বীলত বা ময়ার্দা বর্ণনার উৎস। যা দ্বারা তাদের বিরল সম্মান ও উচুঁ মরতবার কথা প্রকাশ হয় এবং আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর সমূহ নিকৃষ্ট চরিত্র ও ঘৃণিত অবস্থা থেকে তাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আহলে বায়তের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। এ ঘোষণা মূলত তাদের পবিত্রতার উপকারিতা ও ফলাফল বর্ণনার পাশাপাশি যে সব বিষয় তাদের পূণ্যময় অবস্থার অনুপযুক্ত-মহান পরওয়ারদিগার সে সব থেকে আহলে বায়তকে সংরক্ষণ করেছেন। যখনি পবিত্র খিলাফতে মামলাকাত (রাজতন্ত্র) ও সালতানাত (সাম্রাজ্যবাদ)'র আবির্ভাব হয়! মাওলায়ে কায়েনাত আহলে বায়তে রাসুলেকে সে অশোভন ক্ষমতা থেকে রক্ষা করলেন। তার পরির্বতে খিলাফতে বাতেনাহ দান করলেন।

সূফীগণের একটি দল এ কথার উপর দৃঢ়তা পোষণ করেন যে, প্রত্যেক যমানায় 'কুতুবে আউলিয়া' বা অলীবর্গের প্রধান-প্রিয় নবীর বংশ থেকেই নির্বাচিত হয়। যা মূলত পবিত্র আয়াতে ঘোষিত তাতহীর বা পবিত্রতার ফসল। এ মহান ঘোষণার আরেকটি ফসল হলো সাদকাহ গ্রহণকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা সাদক্বাহকে হাদীসে পাকের বর্ণনায় সাদক্বাদানকারীদের ময়লা/আর্বজনা বলা হয়েছে। এমনকি গ্রহণকারীদের জন্য যা লঞ্চনাদায়ক ও বটে।

পক্ষান্তরে নবী বংশের জন্য خمس(খুমস) ও غنيمت (গণীমত) এ অধিকার দেয়া হয়েছে। যে অধিকারে রয়েছে মর্যাদা ও সম্মান। আলে পাকের শৌর্যবীযের অবস্থা এমন যে, হুযুরে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের কাছে দুটো বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনোই গুমরাহ হবেনা। এক কিতাবুল্লাহ/পবিত্র কুরআন,

দুই, আমার বংশধর।

❖ ইমাম দায়লামী (র)'র এক বর্ণনায় এসেছে হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর এবং আমার আহলে বায়তের উপর দরুদ পড়া হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত দোআ/প্রার্থনা বাঁধাগ্রস্থ হয়।

❖ হযরত সা'লাবী হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অত্র আয়াতে কারীমাহ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا অর্থাৎ (তোমরা সম্মিলিত পন্থায় আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। কখনো বিচ্ছিন্ন হয়োনা)'র ব্যাখ্যায় বলেছেন। "আমরাই حبل الله বা আল্লাহর রশি/রজ্জু।

❖ ইমাম দায়লামী (র:) থেকে "মারফু" সনদে বর্ণিত, হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, আমি আমার কন্যার নাম 'ফাতিমাহ' এ জন্য রেখেছি যে, মহান আল্লাহ তাকে এবং তার মুহাব্বাতকারীদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রান দিবেন।

❖ ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস তাসলিমাত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাত ধরে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে এবং তাদের সম্মানিত মাতা-পিতা (হযরত আলী ও হযরত ফাতিমাহ) কে ভালোবাসবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথী হবে। হাদীসে "معيت" বা সাথে হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'নবীজীর নৈকট্য'। কেননা নবীগণের মর্যাদা শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কতইনা সৌভাগ্য ঐ প্রেমিকদের! আহলে বায়তকে ভালোবাসার কারণে নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাম যাদেরকে জান্নাতী বলে শুভসংবাদ দিয়েছেন এবং নৈকট্য দেবার সু-খবর জানিয়েছেন। তবে এ শুভসংবাদ শুধুমাত্র একনিষ্ঠ ঈমানদার বা আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য। শিয়া রাফেযীগণ ঐ মহলের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা নবীজীর সাহাবাদের শানে গুস্তাখী করেছে এবং সিনিয়র সাহাবাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখাকে যারা নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে ফায়সালা কী তা হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিাল্লাহু আনহুর এই ইরশাদ থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেছেন يهلك فى محب مفرط আমার প্রতি চরম (উদ্ভট) ভালোবাসা প্রদর্শণকারী ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসের অন্যত্র এসেছে لا يجتمع حب على وبغض ابى بكر وعمر فى قلب مومن

অনুবাদঃ হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর প্রতি ভালোবাসা এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার প্রতি বিদ্বেষ কোন মুমিনের হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না।

অত্র হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝ যায়, সিনিয়র সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষনকারীগণ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভালোবাসার দাবীতে সম্পূর্ণ মিথ্যুক।

◆ সহীহ হাদীসে এসেছে, হুযুর আলাইহিস সালাম মিম্বার শরীফে আরোহন করলেন। (অতঃপর বললেন) ঐ সকল জাতির কী হলো! যারা এ কথা বলে যে, রোয হাশরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দয়া তথা নৈকট্য লাভ কোন কাজে আসবেনা। খোদার কসম! আমার দয়া-করুনা (নৈকট্য ও সম্পর্ক) উভয় জগতের সাথে সংযুক্ত।

◆ ইমাম কুরতবী আলাইহির রহমাহ মুফাসসির-কুল সর্দার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে অত্র আয়াতে কারীমাহ ولسوف يعطيك ربك فترضى অর্থাৎ (অচিরে আপনার প্রভু আপনাকে এতই দিবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ঠ হয়ে যাবেন)'র তাফসীর নকল করেছেন। তিনি বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ কথার উপরই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, আমার আহলে বায়ত থেকে কেউই জাহান্নামে যাবে না। সুবহানাল্লাহ।

◆ হযরত হাকেম একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যে হাদিসটিকে তিনি 'সহীহ' বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদীসটির সার-সংক্ষেপ হলো- নবীয়ে দোজাহাঁ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার আল্লাহ আহলে বায়ত সম্পর্কে আমাকে বলেছেন, তাদের মধ্য হতে যে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

◆ তাবরানী ও দারু-কুতুনীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, প্রথম যে দলটির জন্য আমি শাফাআত করবো- তা হলো আমার আহলে বায়ত। অতঃপর মর্যাদানুসারে কুরাইশ আনসার। অতঃপর ইয়ামানবাসীদের মধ্য যারা আমার উপর ইমান এনেছে- আমার অনুসরন করেছে। অতঃপর সমগ্র আরববাসী। তারপর অনারবী। আর আমি সর্বপ্রথম যাদের জন্য শাফায়াত করবো তারাই সর্বোত্তম।

◆ বাযযার-তাবরানী ও আবু নুয়াইম রাহিমাহুমুল্লাহ বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন। হযরত ফাতিমাহ পুতঃপবিত্র। আল্লাহ তায়ালা তাকে এবং তার বংশধরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন।

◆ ইমাম বায়হাক্কী আবুশ শায়খ এবং ইমাম দায়লামী রাহিমাহুমুল্লাহুল বারী বর্ণনা করেন, হুযুরে আতহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, কোন বান্দাহ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার প্রাণ থেকে অধিক প্রিয় না হবো এবং আমার আউলাদ তার প্রাণ থেকে অধিক প্রিয় না হবে। আমার আহল (পরিবার) তার আহল থেকে অধিক প্রিয় না হবে এবং আমার সত্তা তার সত্তা থেকে অধিক প্রিয় না হবে।

◆ ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন। নিজের সন্তানকে তিনটি অভ্যাস শিক্ষা দাও। ১। নবীর ভালোবাসা ২। নবীর আউলাদের ভালোবাসা ৩। কুরআন শিক্ষা।

◆ ইমাম দায়লামী আলাইহির রাহমাহ আরো বর্ণনা দেন যে, নবীজী আলইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে সে কুরআনকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাহাবা এবং আমার নৈকট্য প্রাপ্তদের ভালোবাসে।

◆ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেন হুযুর আক্বা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আহলে বায়তের বিষোদগার করে সে মুনাফিক।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা মুনাফিকদেরকে হযরত আলীর প্রতি ঘৃনা রাখার কারণেই চিনতে পারতাম। অর্থাৎ তার প্রতি বিদ্বেষ রাখাই হলো মুনাফিকের নির্দশন বা আলামত।

উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে বুঝতে পারি যে, আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা রাখা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিধান।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

يااهل بيت رسول الله! حبكم فرض من الله فى القران انزله

অনুবাদঃ হে নবীজীর আহলে বায়ত! তোমাদেরকে ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধান। যা কুরআনে পাকে নাযিল করা হয়েছে।

◆ হযরত আবু সাঈদ "শারফুন নুবুওয়াত" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হে ফাতিমাহ! তোমার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয় আর তোমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল হয়।

◆ অত্র হাদিস থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে কেউ নবীজির আওলাদকে কষ্ট দিলো- সে ব্যক্তি নিজেকে মহা সংকটে নিপতিত করলো। কেননা তাদের প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ নিঃসন্দেহে অসন্তুষ্টির কারণ। সে অসন্তুষ্টিই খোদার গযবকে অবশ্যক

করে দেয়। একইভাবে আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা হলো হযরত খাতুনে জান্নাতের সন্তুষ্টির কারণ আর হযরত মা ফাতিমার সন্তুষ্টি মানেই আল্লাহ পাকের রেযামন্দি।

◆ এ কারণে ওলামায়ে কিরাম সুস্পষ্ট বলেছেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নগরের বাসিন্দার প্রতি শিষ্টাচার দেখানো উচিত। তার প্রতিবেশীদের সাথে তা'যীমের সৌজন্যতা প্রদর্শন লাযিম। কেননা সে স্থানটি নবীজির সত্তার সাথে সম্পর্কিত।

◆ ইমাম দায়লামী "মারফু" সনদে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে ওয়াসিলাহ হিসেবে পেতে আশা রাখে এবং কিয়ামতের দিন আমার শাফাআতে ধন্য হতে চায়, সে যেনো আমার আহলে বায়তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে ও আনুগত্য করে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে।

◆ ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত খুযাইফাহ থেকে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন। এই ফারিশতা ইতিপূর্বে কখনো যমিনে আসেনি। এসেছে কেবল আল্লাহর তরফ থেকে আমার উপর সালাম আরয করতে। আর এ শুভাসংবাদ দিতে যে, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমাহ যাহরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হলেন জান্নাতি বিবিদের সর্দার। আর হাসনাঈনে কারীমাঈন (হাসান- হুসাঈন) হলেন জান্নাতী যুবকদের সর্দার।

◆ ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান এবং হযরত হাকেম রাহিমাহুমুল্লাহ বর্ণনা করেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আহলে বায়তের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে আমি নিজেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণকারী এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে সুলেহ (মিমাংশা) করবে প্রকৃত পক্ষে সে আমার সাথে সুলেহ করলো।

◆ ইমাম আহমদ ও হযরত হাকেম বর্ণনা করেন, হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, ফাতিমাহ হলো আমার অংশ বিশেষ। তার কাছে যা বরদাশত নয় আমার কাছে তা বরদাশত হবে না। যা তার কাছে পছন্দের আমার কাছেও তা পছন্দের। কিয়ামত দিবসে আমার বংশ, আমার সূত্র, আমার নিকটাত্মীয় ব্যতীত সমস্ত নসব বা বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

◆ উল্লেখিত হাদীস সমূহ ছাড়া অন্যান্য হাদিস সমূহ যা কুরাইশের ব্যাপারে বিবৃত আছে এবং যত মর্যাদা তাতে বর্ণিত আছে, তার সবটুকুতে আহলে বায়তের শান প্রমানিত হয়েছে। কেননা আহলে বায়তের সকলেই কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত। কুরাইশের সর্বসাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের ব্যাপারে কিছু হাদিস এখানে

উল্লেখ করা হচ্ছে যা হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন জুমুআর খুতবাতে ইরশাদ করেছেন। তা হলো, হে লোক সকল! তোমরা কুরাইশদের অগ্রাধিকার দাও। তাদের মুকাবিলায় নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দিওনা। এমন করেছো তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আনুগত্য ছেড়ে দিওনা। তা না হলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাদের শিক্ষক হয়োনা। তাদের কাছে জ্ঞান অন্বেষন করো। তারা তোমাদের থেকে অনেক মহান/উত্তম। যদি অহংকার করবার সম্ভাবনা না থাকতো- তবে আমি মহান আল্লাহর দরবারে সংরক্ষিত তাদের মর্যাদার ব্যাপারে তাদেরকে জানিয়ে দিতাম।

◆ ইমাম বুখারী আলাইহির রাহমাহ হযরত আমিরে মুআবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, এটি কুরাইশদের শান যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার মুখমন্ডল জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

◆ অন্য হাদীসে এসেছে, তোমরা কুরাইশদেরকে মুহাব্বাত করো। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ভালোবাসে।

◆ ইমাম আহমদ, ইমাম যাহাবী প্রমূখ মুহাদ্দিসিন হযরত উম্মুল মুমিনিন আয়েশাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হযরত জিব্রীল আমিন আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম তন্ন তন্ন করেছি। কাউকেই হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে শ্রেষ্ঠ পাইনি। (হযরত জিবরীল আরো বলেন) আমি জমিনের পূর্ব-পশ্চিম তন্ন-তন্ন করেছি, 'বণী হাশেম বা হাশেমী' বংশের আওলাদের চেয়ে কাউকেই উত্তম পাইনি। অত্র হাদিসের মর্মবাণী খানা কোন এক কবি তার নিজস্ব ভাষায় ঠিক এই ভাবেই ফোটে তুলেছেন-

جبرئیل سے اک روز یوں کہنے لگے شاہ امم
تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم
کی عرض یہ جبرئیل نے اے مہ جبیں تیری قسم
آفاقہا گردیدہ ام سیر جہاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

উম্মতের কান্ডারী একদিন-কহিলেন জীবরীলে।
দেখেছো তুমি বিশ্ব-জাহান- মোরে কেমন জানিলে?
জীবরীল কহে কসম আপনার.......... ।
আমি ঘুরেছি বিশ্ব পূর্ব পশ্চিম
জমীন-আসমান-চড়েছি অসীম।

আমার এ আখিঁ দেখেনি কারীম
আপনার উপমা সৃজেনি রহীম।

◆ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, হযরত হাকেম রাহিমাহুমুল্লাহ হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরাইশের পদস্খলন কামনা করবে, আল্লাহ পাক তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

◆ আবু বকর বাযযার (রঃ) غيلانيات-এ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে বাতনে আরশ বা আরশের মধ্যখান হতে একজন আহবানকারী আহবান করে বলেবে, হে হাশরবাসী! নিজের মাথাকে অবনত করো! চোখ বন্ধ রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কন্যা হযরত ফাতিমাহ্ পুল সিরাত পার নাহন (সুবহানাল্লাহ)। অতঃপর তিনি সত্তর হাজার হুরকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পুলসিরাত পার হয়ে যাবেন।

◆ ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হে ফাতিমা! তুমি কি মুমিনাহ (ঈমানদার) নারীদের সর্দার হওয়াকে পছন্দ করোনি? মুলত এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল হযরত ফাতিমা কে জান্নাতি রমণীদের সর্দার হবার সুসংবাদ দেয়া।

◆ ইমাম তিরমিযী ও হযরত হাকেম (রঃ) বর্ণনা করেন, হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার আহল (পরিবার)'র মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় হলো "ফাতিমাহ"।

সায়্যিদাঈনে জালীলাঈন-শহীদাঈনে আযীমাঈন-হযরাতে হাসনাঈনে কারিমাঈন

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা

হযরত ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান বিন আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আয়িম্মায়ে ইছনা আশারিয়্যাহ'র মধ্যে দ্বিতীয় ইমাম। তাঁর উপনাম হলো আবু মুহাম্মদ। উপাধি-তাক্বী ও সৈয়্যদ-ওরফে সিবতে রাসুলিল্লাহ বা নবীজীর দৌহিত্র অথবা সিবতে আকবার বা বড় নাতি। হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে "রায়হানাতুর রাসুল" এবং 'আখিরুল খুলাফা বিন নস'ও বলা হয়।

জন্মঃ হিজরী ৩য় সনের ১৫ রামদ্বান রাতে মাদীনায়ে তাইয়্যেবায় তার বিলাদত/জন্ম হয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর নাম 'হাসান' রাখেন এবং জন্মের সপ্তম দিবসে আক্বীকাহ সম্পন্ন করেন। অতপর আর আদেশ দিলেন হাসানের চুলের ওজন সমপরিমান রৌপ্য সাদক্বাহ করে দেয়া হোক। তিনি ছিলেন খাস "আহলে কাসা" বা চাদরাবৃতদের অন্যতম। অর্থাৎ যারা নবীজির চাদরে আবৃত হয়ে উভয় জাহানের শ্রেষ্টত্ব হাসিল করেছেন এবং আহলে বায়ত নামে ধন্য হয়েছেন তাদেরকে 'আহলে কাসা' বলা হয়।

হাসান নামকরণ ও নবীজীর মুহাব্বতঃ

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে কেউই সুরতে বা আকৃতিতে সাদৃশ্য পায়নি ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ব্যতিত। তার পূর্বে পৃথিবীর কারো নাম হাসান রাখা হয়নি। এ জান্নাতি নামটি সর্বপ্রথম তাকেই দেয়া হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ওমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবীজীর দরবারে ইমাম হাসান মুজতবার শুভাগমনের সংবাদ পৌছালেন। অতঃপর নবীজী তাশরীফ আনলেন। আর বললেন হে আসমা! আমার আওলাদকে আমার কাছে নিয়ে এস। হযরত আসমা একটি কাপড় জড়িয়ে নবীজীর খিদমাতে হাসানকে নিয়ে আসেন। সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে তাকবীর পড়লেন। অতপর হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রিয় ফরযন্দের কী নাম রেখেছো? তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! অনুমতি ছাড়া অগ্রিম নাম রাখার মত দুঃসাহস আমার হয়নি। তবে আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন- তো আমার খেয়ালে যা এসেছে তা হলো- এ ফরযন্দের নাম 'হারব' (যুদ্ধ) রাখা যেতে পারে। বাকীটা আপনারই ইচ্ছাধীন। পরিশেষে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার নাম "হাসান" রাখলেন।

◆ এক বর্ণনায় এইও এসেছে, নবীজী অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল তাশরীফ আনলেন এবং আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার দরবারে

হযরত আলীর মর্যাদা ঠিক তেমন যেমনটা হযরত মুসার দরবারে হযরত হারুনের মর্যাদা সংরক্ষিত ছিলো। যথাযথ হবে এ আউলাদের পাকের নাম হযরত হারুনের নামানুসারে রাখা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন তার নাম কী ছিল? জিবরাইল আরয করলেন হযরত হারুনের নাম ছিল 'শাব্বির'। প্রিয় নবী এবার বললেন হে জিবরীল! অভিধানে এ শব্দের অর্থ কী? জিবরীল বললেন হাসান (সুন্দর)। অতঃপর তার নাম 'হাসান' রাখা হলো।

◆ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, একবার আমি রুহে মুজাসসাম, জানে মুসাওয়ার, সৈয়্যদ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাক্ষাৎ লাভ করি। ঐ সময় ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর কাঁধ মোবারকে চড়ে আছেন। এমন হালতে নবীজী দোয়া করছিলেন হে রব! আমি হাসানকে ভালোবাসি-অতএব তুমিও তাকে ভালোবাসো।

◆ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মিম্বারে তাশরীফ রাখলেন। হযরত ইমাম হাসান নবীজির বাহু মুবারকে ছিলেন। এ অবস্থায় নবীজী একবার উপস্থিত জনতার দিকে আরেকবার ইমাম হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন। (রাবি বলেন) আমি নবীজীকে ইরশাদ করতে শুনেছি, এ হলো আমার ফরযন্দে সাইয়্যেদ। মহান আল্লাহ তার বদৌলতে মুসলমানের দুটো দলের মাঝে সুলেহ বা মীমাংসা করবেন।

◆ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হাসান ও হুসাঈন এই পৃথিবীতে আমার দুটি ফুল।

◆ তিরমিযী শরীফে আছে, নবীজি আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, হাসান ও হুসাইন উভয়ে বেহেশতী যুবকদের সরদার।

◆ ইবনে সা'দ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আহলে বায়তের মধ্যে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অধিক প্রিয় ছিলেন হযরত ইমাম হাসান। একবার আমি দেখেছি নবীজী সাজদাহ রত আর সাহিবযাদাগণ গর্দান মুবারক অথবা পিঠে বসে আছেন। যতক্ষণ না তারা নেমে না আসতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবীজীও মাথা মুবারক উঠাতেন না। আমি দেখেছি নবীজী রুকুরত হতেন আর প্রিয় দৌহিত্রদের জন্য পাক কদমদ্বয়কে এত বেশী বিস্তৃত করে দিতেন। যাতে তারা সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন।

মানাক্বিব/গুণাবলী:

নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গুণাবলীর শেষ নেই। জ্ঞান-সম্মান শৌর্যবীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, তপস্যা ও আনুগত্যে ছিলেন তিনি সুউচ্চ। তিনি দান করতেন অকাতরে। হযরত ইমাম হাসান জনে জনে লাখো দাক্ষিণ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

◆ হযরত হাকেম (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইদ ওমাইর থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পঁচিশবার পায়ে হেটে হজ্জ্ব করছেন। বাহন তার সঙ্গী হবার চেষ্টা করতো কিন্তু ইমাম আলী মকাম'র বিনয় ইখলাস ও আদবের চাহিদা ছিলো যে, তিনি শুধুমাত্র পায়ে হেটে হজ্বের সফরে যাবেন। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাষা ছিলো মাধুর্যপূর্ণ ও সাবলিল। এমনকি মজলিসে লোকেরা না চায়তো যে, তার বক্তব্য সমাপ্ত হয়ে যাক।

◆ হযরত ইবনে সা'দ (রাঃ) হযরত আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জীবনে দু'বার আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ দান করে দিয়েছেন। তিনবার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক দান করার সময় এমন নিখুঁতভাবে ভাগ করেছিলেন যে, না'লাঈন শরীফ (জুতা মোবারক) এবং মোজা থেকেও একটি একটি করে দিয়ে দিতেন এবং একটি করে নিজের কাছে রেখে দিতেন।

সহনশীলতা

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহনশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, তার ওফাতের পর সেই সহনশীলতার কথা স্মরণ করে 'মারওয়ান' খুব কান্না করেছিলো (ইবনে আসাকির)। হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হে মারওয়ান! আজতো তুমি কান্না করছ। অথচ তার জীবদ্দশায় তার সাথে কতোইনা মন্দ আচরন করেছো! তখন মারওয়ান পাহাড়ের দিকে ইশারাহ করে বলতে লাগলো, আমি পাহাড়ের চেয়েও অধিক সহনশীল ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করতাম। আল্লাহু আকবর! হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সহনশীলতার কথা মারওয়ান পর্যন্ত স্বীকার করেছে। তার উদারতা-সহনশীলতা ছিলো পাহাড়ের চেয়ে অধিক উচ্চ।

হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফত

হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের মাসনাদে আলোকিত হন। কুফাবাসী তার পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তিনি কিছু দিন খিলাফতে থাকার করার পর

খিলাফতের এ মহা দায়িত্ব হযরত আমীরে মুআবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিম্নোক্ত শর্ত-সাপেক্ষে হস্তান্তর করেন।

১) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব শেষে তা পুনরায় হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছবে।

২) মাদীনাহ-হিজাজ এবং ইরাকবাসীর মধ্য হতে কাউকেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল বিষয়ে ধর-পাকড় কিংবা অনুসন্ধান করা যাবে না।

৩) হযরত আমিরে মুয়াবিয়া হযরত ইমাম হাসানের দিওয়ান বা দপ্তরের কাজ সম্পাদন করবেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকল শর্তাবলী মেনে নিলেন এবং পরস্পর সন্ধি হলো। ঐ ঐতিহাসিক সুলেহ বা সমঝোতা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার (পূর্ব ঘোষণার প্রতিফলন) মু'জিযার প্রকাশ পেলো। কারণ নবীজী পূর্বে ইরশাদ করেছিলেন- মহান আল্লাহ এ প্রিয় আউলাদ (ইমাম হাসান)'র বদৌলতে মুসলমানের দুটো দলের মাঝে মীমাংসা করাবেন। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু 'তখতে সালতানাত' হযরত আমিরে মুয়াবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য উম্মুক্ত করে দিলেন।

এ ঘটনাটি ছিলো হিজরী ৪১ সনের রবিউল আউয়াল মাসে। হঠাৎ এভাবে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গী সাথীদের পছন্দ হয়নি। তারা এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রশাংসা করলেও পরোক্ষভাবে মূলতঃ অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। হযরত ইমাম হাসান তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন যে, এ রাজত্বের জন্য তোমাদেরকে কতল করা হোক- তা আমার কাছে বরদাশত হবে না। তাই খিলাফত ছেড়ে দিলাম। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফা ত্যাগ করেন এবং মদীনায়ে তাইয়্যেবাহ বসবাস শুরু করেন। এদিকে হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রাপ্য ভাতা পৌছুতে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। ফলে তিনি দরিদ্রতার মুখোমুখি হন। ফলে এ ব্যাপারে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে 'অভিযোগ পত্র' পাঠানোর ইচ্ছা করেন। এমনকি পত্র লেখার জন্য কালিও সরবরাহ করেন। কিন্তু পরিশেষে কি যেনো ভেবে থেমে গেলেন। হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইমাম হাসানকে স্বপ্নে দীদার দিলেন। নবীজী অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। বললেন, হে প্রিয় বৎস! কী অবস্থা? হযরত হাসান বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! ভালো আছি। অতপর প্রাপ্য ভাতার বিলম্ব হওয়া প্রসঙ্গে অভিযোগও করলেন। নবীজী বললেন, হে হাসান তুমি কালি

এনেছিলে এমন একজন মাখলুকের কাছে স্বীয় কষ্টের কথা জানিয়ে অভিযোগ করতে, যে কিনা তোমারই মত একজন মাখলুক! হযরত হাসান বললেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহু! আমি মাজবুর ছিলাম। কীইবা করার আছে? রাহমাতুল্লিল আলামীন বললেন, এ দোআটি পাঠ করো-

اللهم اقذف فی قلبی رجائك واقطع رجائی عمن سواك حتی لا ارجوا احدا غیرك، اللهم وما ضعفت عنه قوتی وقصر عنه عملی ولم تنته الیه رغبتی ولم تبلغه مسئلتی ولم یجر علی لسانی مما اعطیت من الاولین والاخرین من الیقین تخصنی به یا رب العالمین-

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে তোমার কামনা ঢেলে দাও। তুমি ব্যতিত আমার কামনাকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। যাতে তুমি ছাড়া কারো কাছেই আমার কামনা যেন না রাখতে পারি। হে প্রতিপালক! তার সাথেই আমাকে খাস করো যা দ্বারা আমার শক্তি দূর্বল হয়ে যায়, আমার আমল হ্রাস্বতর হয়ে যায় এবং যে পর্যন্ত আমার আগ্রহ, আমার হাতপাতা না পৌছে। আমার মুখে তা যেনো জারী না হয়। তুমি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে যাকেই দিয়েছ, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর।

❖ হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ দোয়াটি পাঠান্তে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়নি। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া আমার কাছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তোহফা পাঠিয়ে দিলেন। আমি মহান আল্লাহর হামদু-ছানা (গীত-গুঞ্জনা) আদায় করলাম এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অতঃপর স্বপ্নে পুনঃরায় নবীজিকে দেখার দৌলত লাভ করি। সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হাসান! কী অবস্থা? মহান আল্লাহর শুকর আদায় করে আমি সম্পুর্ন ঘটনা খুলে বলি। অতঃপর নবীজী ইরশাদ করলেন, হে প্রিয় বৎস! যে ব্যক্তি সৃষ্টি থেকে হাত না পেতে স্রষ্টার কাছেই আশা করবে তার কাজ এমনি করেই পূর্ণ হয়।

হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাত

হযরত ইবনে সা'দ রাহিমাহুল্লাহু হযরত ইমরান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ত্বালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, কেউ একজন হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে দেখতে পান যে, তার দু'চোখের মধ্যখানে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" লিখা আছে। তার পরিজন এ ঘটনায় বেশ খুশি হলেন। কিন্তু যখনি এ স্বপ্নের কথা হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বর্ণনা করা হয় তখন তিনি বললেন, যদি বাস্তবেই এ স্বপ্ন দেখা হয়েছে- তো ইমাম

হাসানের হায়াতের অল্প কিছুদিন বাকী আছে। পরবর্তীতে এ ব্যাখ্যাটিই সত্য হলো এবং খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। বিষের প্রভাবে পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তীব্র পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়। পেটের অভ্যন্তরে প্রতিটি অংশ টুকরো টুকরো হয়ে পাতলা পায়খানার সাথে বের হতে থাকে। এমন অসহ্য যন্ত্রণায় আরো চল্লিশ দিন কেটে যায়। ওফাত নিকটবর্তী সময়ে প্রিয় ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানতে চায়লেন- হে বড় ভাই! কে সেই ব্যক্তি যে আপনাকে বিষ দিয়েছে? হযরত হাসান বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করবে? ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অবশ্যই কতল করবো। হযরত ইমাম আলী মকাম বললেন- যার দিকে আমার সন্দেহের তীর এবং বাস্তবে সেই যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহই প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তার ধর-পাকড় বড়ই কঠিন হবে। আর যদি সে না হয়ে থাকে, তো আমি চাইনা আমার কারণে নিরপরাধ কেউ সংকটে পতিত হোক। হে হুসাইন! আমাকে এর পূর্বেও বিষ দেয়া হয়েছিলো কিন্তু এ বারের বিষ গুলো খুবই শাক্তিশালী অনুভুত হচ্ছে। হযরত ইমাম হাসানের মরতাবা কতো সু-উচ্চ জানা নেই, যিনি কঠিন যন্ত্রণায় পতিত, নাড়ি-ভুড়ি টুকরো টুকরো বের হয়ে আসছে। শাহাদাতের আলিঙ্গণ ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে, এতদস্ত্বেও ইনসাফের বাদশাহ স্বীয় আদালত ও ইনসাফের বরখেলাফ করলেন না। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্তহীন হবার প্রমাণ রেখে গেলেন। সর্তকতা ও দূরদর্শিতা তাকে অনুমতি দেয়নি যে, যার দিকে সন্দেহের তীর, তার নাম উল্লেখ করে দেয়া হোক। ঐ সময় হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল ৪৫ বছর কয়েক মাস কিছু দিন। হিজরীর ৪৯ সনের ৫ রবিউল আউয়াল মদীনা মুনওয়ারাতে অস্থায়ী এ জগত ছেড়ে তিনি চির বিদায় নিলেন- ইন্নাল্লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ওফাতের সন্নিকট সময়ে হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন যে, মুহতারাম বড় ভাই ইমাম হাসানের অস্থিরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখায়বে বিষন্নতার নির্দশন তীব্রতর হতে চলেছে। এমন নাজুক হালত দেখে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শান্তনার বারতা শুনালেন। বললেন হে ভাইজান! কেনো অস্থির হচ্ছেন? কেনইবা বিষন্নতা প্রকাশ করছেন? আপনাকে মুবারকাবাদ! মুবারকবাদ হে ভাইজান! অনতিবিলম্বে হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সান্নিধ্যে আপনি মিলিত হবেন। অচিরেই হযরত আলী, হযরত খাদীজাহ, মা ফতিমাহ, হযরত কাসিম, হযরত তালিব এবং হামযাহ ও জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে আপনার সাক্ষাত হবে। অতএব চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে প্রিয় হুসাইন! আমি এমন কিছু ব্যাপারে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছি যা ইতিপূর্বে করা হয়নি এবং খোদার সৃষ্টির মাঝে এমন সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি যে সবের সাদৃশ্য ইতিপূর্বে দেখা হয়নি। সে সাথে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া হৃদয় বিদারক কারবালার ঘটনা এবং কুফাবাসীদের বদ আচরণ-নির্যাতনের কথাও বলে দিলেন। ইমাম হাসানের এ ইরশাদে মুবারক থেকে বুঝা যায়, ঐ সময়েও কারবালার সে ভয়াবহ-রক্তাক্ত দৃশ্য এবং প্রিয় ছোট ইমাম হুসাইনের অসহায়ত্বের নক্শাহ চোখের সামনে ভাসছিলো আর জঘন্য কুফাবাসীর নির্যাতনের ছবি তাকে আরো বিষণ্ন করে তুলছিল। হযরত ইমাম হাসান আরো বললেন, আমি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে আবেদন রেখেছিলাম যে, যেন আমাকে নানাজানের পবিত্র রওজার পাশেই দাফন করা হয়। তিনি আমার এ আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তদুপরি যেন আমার ওফাতের পর তার খিদমাতে বিষয়টি পুনঃরায় আরয করা হয়। তবে আমার মনে হচ্ছে কাওম এ কাজে বাঁধা সৃষ্টি করবে। যদি তারা সত্যিই বাধা দেয়, তাহলে জবরদস্তির কোন প্রয়োজন নেই।

অতঃপর হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর ওসিয়ত মুতাবেক উম্মুল মুমিনিন আয়েশাহ সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে আবেদন পেশ করা হয়। মা আয়েশাহও তার কবুল করে নিলেন। ইরশাদ করলেন, আমি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে কবুল করলাম। কিন্তু ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা সত্যে হয়নি। মারওয়ান এ কাজে বাধাঁ সৃষ্টি করলো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, শেষ পর্যন্ত হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীদের হাতিয়ার স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি তাদেরকে ইমাম হাসানের ওসিয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে ফারযন্দে রাসুল, জিগারে গুশায়ে বাতুল হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জান্নাতুল বাক্বী শরীফে প্রাণ প্রিয় জননী খাতুনে জান্নাত ফাতেমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার পাশে দাফন করা হয়।

লক্ষণীয়ঃ একটি প্রচলিত মিথ্যার খণ্ডন

ঐতিহাসিকগণ জু'দাহ বিনতে আশআছকে বিষ প্রয়োগকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এও বলেছেন ঐ মহিলা নাকি হযরত ইমাম হাসানের স্ত্রী এবং ইয়াযিদ নাকি বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিতে তাকে দিয়ে বিষ প্রয়োগ করিয়েছে। ফলে ঐ মহিলা লোভে পড়ে হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ দিয়ে শহীদ করেছে।

মূলতঃ এ বর্ণনার কোন সহীহ সনদ নেই। সহীহ সনদ ব্যতিত কোন মুসলমানকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা কোন অবস্থায় বৈধ নয়। তদুপরি এমন মহান সত্তার মহা হত্যাকান্ডের জন্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে দায়ী করা কিভাবে জায়েয হাতে পারে? ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া অথবা কোন ধরনের রেফারেন্স ছাড়া এমন বর্ণনা লিখে দিয়েছে যা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া সংবাদটি বর্ণনার দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়। কারণ কোন ঘটনার বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেয়া সমসাময়িককালে যতটুকু সহজসাধ্য, পরবর্তী সময়ে তার হুবহু বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেয়া ততটুকু সহজসাধ্য নয়। তদুপরি ঘটনাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আহলে বায়তে আতহারের মহান ইমাম হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কতল হয়েছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সতর্কতা ও স্বচ্ছতা আরো বেশী জরুরী। কারণ এই হত্যাকারী কে তার সঠিক তথ্য অন্য কেউ জানাতো দুরের কথা! স্বয়ং ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও অবগত নন। তাছাড়া ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই বলেছেন, ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিষ প্রয়োগকারী কে তা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বার বার জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইমাম হাসান সে বিষয়ে কখনো বলেননি। অতঃপর এ বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিষ প্রয়োগকারী সম্পর্কে জানতেননা। এছাড়া হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু তার হত্যাকারী সম্পর্কে কিছুই বলে যাননি। অতএব জু'দাহকে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করার নীতিগত অধিকার কারো কাছে নেই। আরো বিশুদ্ধ কথা হলো, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অথবা ইমামদ্বয়ের কোন সাহিবযাদার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত জু'দাহ যে হত্যাকারী সে বিষয়ে কোন প্রমান পৌঁছাইনি এবং তাদের মধ্য হতে কেউই জু'দাহ কে হত্যার জন্য শরয়ী পন্থায় ধরপাকড়ও করে নি। আরো একটি বিশেষ কারণে এ ঘটনাটি বিশ্লেষণযোগ্য, তাহলো হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিবি কোন আজনবী পুরুষের সাথে সঙ্গবদ্ধ যোগসাজস করবে এবং তার অপবাদও ঐ বিবির উপর জুড়িয়ে দেয়া হবে, যা শুধু আশ্চর্যজনক নয় রবং অধিকতর নিকৃষ্টও বটে। মুলত এ অপরাধের ভিত্তি খারেজী সম্প্রদায়ের মিথ্যে রটনা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য পন্থায় সুস্পষ্ট যে, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অধিক বিবাহকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় একশজন নারীকে বিয়ে করেছেন এবং তালাক্বও দিয়েছেন। অধিকাংশ স্ত্রীকে এক/দুই রাতের পরে তিনি তালাক্ব দিতেন। এ সম্পর্কে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, এটি ইমাম হাসানের আদত বা অভ্যাস যে, তিনি তালাক প্রদান করতেন। কোন স্ত্রী তার সাথে জুড়ে থাকতেন না। এতদসত্ত্বেও মুসলিম রমনীগণ এবং তাদের মাতা-পিতাগণ কামনা করতেন যে, জীবনের একটি মুহূর্ত অন্তত তার দাসী হয়ে সৌভাগ্য হাসিল করবে এবং বাকী জীবনটা ইমামের মুহাব্বাতে কাটিয়ে দেবে। অতএব হযরত ইমাম হাসানের স্ত্রী এমন মুবারক সান্নিধ্যের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে নাপাক ইয়াদিদের প্রতি আসক্ত হয়ে ইমাম হাসানকে হত্যা করবার মতো জগন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়বে তা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

কারবালা প্রান্তরে রক্তাক্ত দৃশ্যের অবতারণা

সায়্যিদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বে-নযীর জানবাযী

শুভাগমন

সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হিজরী ৫৪সনের ০৫ সনের ০৫ শা'বান মাদীনায়ে মুনাওয়ারাতে শুভাগমন করেন। হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর নাম 'হুসাইন ও শাব্বার' রাখেন। হযরত হুসাইনের কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবু আবদুল্লাহ আর লকব বা উপাধি হলো "সিবতু রাসুলিল্লাহ ও রায়হানাতুর রাসুল"। বড়ভাই হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতো তাকেও বেহেশতের যুবকদের সরদার বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রিয় নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খুবই ভালোবাসতেন। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

عن ابن عباس من احبهما فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی

অনুবাদ: যে ব্যক্তি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালবাসলো প্রকৃত পক্ষে সে আমাকে ভালোবাসলো। যে ব্যক্তি এদু'জনের প্রতি বিদ্বেষ রাখলো মুলত: সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখলো।

জান্নাতি যুবকদের সরদার বলার উদ্দেশ্য হলো, যে সকল ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় নিজের যৌবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে জান্নাতী হয়েছে। হযরত ইমামদ্বয় হলেন তাদের সরদার। সে দৃষ্টি কোন থেকে তাদেরকে কম বয়সীও বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া মানুষ যে বয়সেরই হোক না কেনো? তার মুরব্বীরা তাকে যুবক নয় বরং বাচ্চা বলে ডাকে। শায়খ কিংবা বৃদ্ধ বলে ডাকেনা। একইভাবে যৌবন ও পুরুষত্বের ক্ষেত্রেও জাওয়ান শব্দটা ব্যবহার হয়ে আসছে। চাই সে মানুষটি বৃদ্ধ হোক কেন! কিন্তু সাহসিকতায় যেনো পূর্ণ পুরুষ। স্বীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক থেকে তাকে যুবক বলা হয়। অতএব হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বয়সের দিক থেকে যদিও পঞ্চাশ পার করেছেন তদুপরি তার সাহস ও পৌরুষত্ব এমনকি মেহেরবাণীর দিক থেকে তিনি যেনো একজন পূর্ণ যুবক ছিলেন। জান্নাতী যুবকদের সরদার দ্বারা এমন অর্থও বুঝানো যেতে পারে যে, হযরত ইমাম হুসাইন হযারাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়া সমস্ত জান্নাতবাসীদের সরদার। কেননা জান্নাতী যুবক দ্বারা সমস্ত জান্নাতবাসীই উদ্দেশ্য। কারণ জান্নাতে বৃদ্ধও যুবকের মাঝে কোন পার্থক্য করা হবে না। প্রত্যেকেই সেখানে যুবক হয়ে যাবে এবং সবার বয়সও হবে সমান।

হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে নিজের দুটি "ফুল" বলে আখ্যা দিয়েছেন
هما ريحانتاى من الدنيا তিনি বলেছেন, হাসান ও হুসাইন দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল (তিরমিযী)। হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ দুই নিষ্পাপ সন্তান থেকে ফুলের মতো সু-ঘ্রাণ নিতেন, সিনায়ে মুবারকে জড়িয়ে নিতেন। (তিরমিযী)

বিস্ময়কর স্বপ্ন

হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চাচী হযরত উম্মুল ফদ্বল বিনতে হারেস (হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী) একদা নবীজীর দরবারে হাযির হলেন। আরয করলেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আজ আমি হতাশাজনক একটি স্বপ্ন দেখেছি। নবীজী বললেন, কী দেখেছো? উম্মুল ফদ্বল বললেন, খুবই ভয়ানক! কোন ভাবে তিনি সে স্বপ্ন বর্ণনায় সাহস পাচ্ছিলেননা। প্রিয় নবী বারবার জানতে চায়ছিলেন। এক পর্যায়ে উম্মুল ফদ্বল আরয করলেন হে আল্লাহ রাসুল! আমি দেখেছি আপনার দেহ মুবারকের থেকে একটি টুকরা কাটা হয়েছে আর তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। নবীজী ইরশাদ করলেন, তুমি খুবই উত্তম স্বপ্ন দেখেছো। আল্লাহ চাহেতো ফাতিমার একটি পুত্র সন্তান হবে আর তাকে তোমার কোলে দেয়া হবে। বাস্তবে তাই হলো। হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভুমিষ্ঠ হলেন এবং তাকে উম্মুল ফদ্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কোলে রাখা হয়।

◆ হযরত উম্মুল ফদ্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, একদিন আমি হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমাতে হাযির হয়ে হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজীর কোল মুবারকে দিলাম। আমি দেখতে পেলাম, প্রিয় নবীর দু'নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আমি আরয করলাম হে আল্লাহর নবী! আমার মা-বাবা নবীজীর কদমে কুরবান হোক। কী হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেনো? হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করলেন, হে উম্মুল ফদ্বল! হযরত জীবরীল আমিন আমার কাছে এসেছে আর বলেছে আমার উম্মত আমার এ আউলাদকে শহীদ করে দিবে। আমি আরয করলাম- হুসাইনকে? নবীজী বললেন হ্যা! আরো বললেন, জীবরীল ঐ স্থানের (কারবালা) লাল রংয়ের মাটিও আমার কাছে নিয়ে এসেছে। (আদ-দালায়িল, ইমাম বায়হাক্বী (র:)

শাহাদাতের জনশ্রুতি

জন্মের শুভ সংবাদের সাথে সাথে ইমাম আলী মকামের শাহাদাতের সংবাদ টিও জনরবে পরিণত হতে লাগলো। দুগ্ধপানের সময়টিতে হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উম্মুল ফদ্বল কে ইমামে পাকের শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কী করুন বাস্তবতা! খাতুনে জান্নাত এ নবজাতককে কারবালার যমীনে রক্ত ঝরাবার জন্যই কি বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন, মওলা আলী কলিজার টুকরা হুসাইনকে কারবালার ধুলো-বালিতে গড়াগড়ি করে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য কোলে পিঠে লালন করেছেন! নানাজান মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দয়া-মায়াহীন প্রান্তরে তৃষ্ণার্থ ঐ কণ্ঠনালী দ্বিখন্ড করতে এবং খোদার পথে বীরবেশে প্রাণ বিসর্জন দেবার লক্ষ্যে প্রাণসম দৌহিত্র ইমাম হুসাইনকে রহমতের বাহুতে লালন-পালন করে বড় করেছেন! সে মহান বাহুর কথা বলি, যে বাহু রহমতের জান্নাতী বাগান-জান্নাতী দালান-কোঠা থেকে কোনভাবেই কম মর্যাদার নয়। কোথায় বা তার মরতবার অন্ত? আর সেই কোলে যিনি লালিত হয়েছেন সে স্বত্বা (ইমাম হুসাইন)'র সম্মানের অনুমান কিভাবে হয়? কতোইনা মর্মস্পর্শী ক্ষণ ছিলো সে মুহুর্তটি, যখন প্রিয় আওলাদের জন্মের উচ্ছাস মুখর পরিবেশের সঙ্গে তার দুঃখ ভরা শাহাদাতের সংবাদটিও এসে পৌছলো। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রহমতের নেত্রে অশ্রু প্রস্রবন জারী হলো। আহলে বায়তের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী জলীলুল কদর সাহাবীদের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হতে লাগলো। প্রাণ প্রিয় পিতা- মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়কে জিজ্ঞেস করে দেখো- লখতে জিগারের শাহাদাতের সংবাদে যন্ত্রণার আস্বাদন কেমন হতে পারে? সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যিনি সুন্নাতে খলিল আদায় করতে চলেছেন। হযরত খাতুনে জান্নাত-বেহেশত'র জান্নাতি উদ্যান-যার কদমে পাকে কুরবান, তার কলিজার টুকরার জন্য কতইনা নাজুক হালত অপেক্ষা করছে! যে প্রিয় সন্তান বুকে আগলে আছে, মায়াভরা দৃষ্টিতে নুরের পুতলাকে যিনি দেখে আছেন। খুশি মনে অভিবাদনের হাসিতে প্রিয় পুতলাকে দিলরুবায়ী করছেন। মমতা-স্নেহে জড়িয়ে রেখেছেন। ক্রমান্বয়ে ভালোবাসার সমুদ্রে ডেউয়ের তরঙ্গ হতে চলেছে। মায়ের স্নেহভরা কোলে খেলতে খেলতে যেনো মাতৃ মমতার উত্তাল তরঙ্গকে আরো জোরদার করে তুলেছে। মিটিমিটি দৃষ্টি আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথন হৃদয়কে যেনো আরো ধাবিত করে চলেছে। ঠিক সে সময় খাতুনে জান্নাতের নয়ন কোঠায় মর্মন্তুদ কারবালার দৃশ্যপট ভেসে উঠে। যেখানে প্রিয় তনয়ের ছোট্ট দল ক্ষুর্ধাত-তৃষ্ণার্থ অবস্থায় নির্মমভাবে শহীদ হতে যাবে! না আছে বাবা আলী মুরতাদা! না আছে ভাই হাসান মুজতাবা! না আছে কোন স্বজন-প্রিয়জন। ভাই শহীদ হয়ে গেল প্রিয় ফরযন্দও শহীদ হয়ে যাবে- এ একাকীত্ব বড়ই নাযুক! বড়ই মর্মান্তিক! একদিকে অবিরাম তীরের বর্ষনে নুরের দেহ রক্তে রঞ্জিত, অন্যদিকে স্বীয় শিবিরে উৎকণ্ঠিত স্বজনের করুন আর্তনাদের প্রত্যক্ষকরণ! এরই মাঝে খোদার পথে প্রাণ বির্সজনের হৃদকম্প দৃশ্যপট। নবী কাননের ফুলের কারণে যে কারবালা রঙিন হবার কথা, যে ফুলের খুশাবো প্রিয় নবীজীর কাছে অতি

পছন্দের, যে ফুলের সুঘ্রান কুফার জংগলের সর্বত্র খুশবুময় করে দেবার কথা ছিল, উল্টো সে ফুলটি আজ কুরবান হতে চললো। বার বার খোনময় কারবালার দৃশ্যটি মা ফাতিমার নয়নে ভেসে উঠছিলো। আর প্রাণসম পুত্রকে বার বার বুকে জড়িয়ে ধরছিলেন। হে পুত্র বিসর্জনকারীনি হাজারাহ! এ দৃশ্যটি দেখুন। যে দৃশ্যের মুখোমুখি আপনিও হয়েছেন। আপনিই ভালো বুঝেন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করণে একজন মায়ের অনুভুতি কেমন হতে পারে?

উচিত ছিলো এমন ভাবে দেখা, কুরবান হতে যাওয়া এ ফরযদের নানা কে? যার নানাজান তিনিতো আল্লাহর হাবীব- যিনি এই বিশ্ব স্রষ্টার প্রিয় পাত্র। যার সন্তুষ্টি লাভে মালিকে কায়িনাত নিজেই ঘোষনা দিলেন- ولسوف يعطيك ربك فترضى এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমনভাবে দিবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। জলে-স্থলে যার হুকুমের বাস্তবায়ন হয়, গাছ পাথর যাকে সালাম আরয করে এবং যার ফরমানের আনুগত্য করে, যার খিদমাতে ঐ বদরের প্রান্তরে খোদ ফারিশতাগণ লশকর বেশে যুদ্ধ করেছে। যার ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে, ডুবে যাওয়া সূর্য যার হুকুমে ফের উদয় হয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি কনায় যার হুকুমাত চলে, যার চোখের ইশারায় পূর্বাপর সকলের মুশাকিল আছান হয়, যার গোলামের সাদক্বায় সৃষ্টি কুলের কর্ম সম্পাদন হয়-সাহায্য নসীব হয়। রিযিকের ব্যবস্থা হয়। বুখারী শরীফে এসেছে هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল [নৈকট্যধন্য]দের ওয়াসিলায় তোমাদের জন্য রিযিক ও সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। তদুপরি প্রিয় পুত্রের শাহাদাতের সংবাদের কেবলমাত্র চোখ মুবারক থেকে অশ্রুই বয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নানাজান আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাত মুবারক ফরিয়াদের নিমিত্তে উত্তোলিত হয়নি। কলিজার টুকরা দৌহিত্রের নিরাপত্তা বিধান এবং ভয়ানক ঘটনা থেকে পরিত্রানের জন্য দোআ করা হয়নি। জন্মদাতা পিতা হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোন দিন এ আরয রাখেননি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুত্রের শাহাদাতের সংবাদতো হৃদয়কে গুড়ো করে দিয়েছে। খোদার দরবারে এ ফরযন্দের জন্য একটু দোআ করুন। মমতাময়ী মা খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার পক্ষ থেকেও বলা হয়নি যে, হে দু'জাহানের বাদশাহ! অবশ্যই আপনার করুণার বর্ষনে বিশ্ব দয়াপ্রাপ্ত হয়। আপনার ফরিয়াদ সতো রবের দরবারে কবুল হয়। মেহেরবাণী করুন। আমার এপ্রিয় সন্তানের জন্য প্রার্থনা করুন।

নাহ কেউ করেননি! সে দিন কেউই দোআ করেন নি। না আহলে বাইত- না নবীজীর পুতঃপবিত্র বিবিগণ না কোন সাহাবা। কেউ বলেননি যে, হে মা'বুদ! তুমি রক্ষা করো! এ নির্মমতা থেকে তুমি হিফাযাত করো। কেবল শাহাদাতের খবর শুনেই যাচ্ছিলো আর বিদ্যুৎবেগে তা প্রসার হচ্ছিলো কিন্তু দরবারে রিসালাতে কোন দরখাস্ত আসছিলো না।

প্রকৃত কথা হলো, পরীক্ষাস্থলে অটলাবস্থা জরুরী। এ মহলটি ওযর ও গবেষণার নয়। এমন মাওকায় অবহেলা করা মর্দে মুজাহিদের পন্থাও নয়। বরং নিষ্ঠার সাথে জান কুরবান করাই আসল কামনা। এ জন্যে নবীজীর প্রার্থনা ছিলো যেনো প্রিয় আউলাদ পূর্ণ অটল ও দায়িত্ববান থাকে। মহান আল্লাহর সহযোগিতা যেনো অব্যাহত থাকে। মুসীবাতের আক্রমন আর কষ্টের তীব্রতা যেনো হুসাইনের কদমকে পিছু না হটায়।

হাদীসে পাকে শাহাদাতের সংবাদ

হাদীস শরীফে ইমাম আলী মকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহদাতের বহু বর্ণনা বিবৃত আছে। হযরত ইবনে সা'দ ও ইমাম তাবরানী আলাইহির রাহমাহ হযরত উম্মুল মু'মিনিন আয়েশাহ সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন। হুযুরে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হযরত জীব্রীল আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আমার ওফাতের পর আমার আওলাদ হুসাইনকে "তৃফ" যমীনে শহীদ করে দেয়া হবে। জীবরীল আমার নিকট সে যমীনের মাটিও এনেছে আর বলেছে এ মাটি হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর مقتل বা শহীদ গাহের ! তৃফ হলো কুফার নিকটবর্তী ঐ স্থান যেটিকে কারবালা বলা হয়ে থাকে।

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার ঘরে এমন ফারিশতার আগমন ঘটেছে, যে ফারিশতা ইতিপূর্বে আর কোন দিন আসেনি। সে আরয করলো, আপনার ফরযন্দ হুসাইনকে শহীদ করে দেয়া হবে। আপনি যদি চান তবে আমি তার শাহাদাত স্থলের মাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর ফারিশতা অল্প লাল রঙের মাটি আমার সামনে হাযির করলো।

- এ জাতীয় বহু হাদীস রয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে বৃষ্টির ফারিশতা কর্তৃক সংবাদ দেবার কথা উল্লেখ আছে। কোথাও হযরত উম্মে সালমাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা কর্তৃক কারাবালার মাটি ন্যস্তকরণ এবং সেই মাটি রক্তে রূপ ধারণ করার মধ্যে দিয়ে ইমামে পাকের শাহাদাতের বাস্তবতার নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। যা থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই শাহাদাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন। যা ইমাম পাকের শৈশব থেকে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সকলে একথাও জেনে গিয়েছিলো যে, তার শহীদ হবার স্থান হবে কারবালা।

- হযরত হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সন্দেহের অবকাশ ছিলনা এবং আহলে বাইত ও সুস্পষ্ট জানতেন যে, ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কারবালায় শাহাদাত বরণ করবেন।

- হযরত আবু নুয়াঈম (রাঃ) হযরত ইয়াহইয়া হাদ্বরামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

বর্ণনা করেন, সিফফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সফর সঙ্গী ছিলেন। যখন তার নিনাওয়া নামক অঞ্চলের নিকটে পৌছলেন, সেখানে হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালামের মাযারে পাক অবস্থিত। তখন হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আওয়ায দিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! ফোরাতের কিনারায় দাড়াঁও। আমি বর্ণনাকারী আরয করলাম হে আমিরুল মুমিনিন! কী জন্য? তিনি বললেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন, জীবরীল আমিন আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, ইমাম হুসাঈনকে এ ফোরাতের প্রান্তরে শহীদ করা হবে এবং সে স্থানের এক মুটো মাটিও ফারিশতা নবীজিকে দেখিয়েছে।

◆ হযরত আবু নুয়াঈম (রাঃ) নাবাতা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমরা হযরত মওলা আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সফর সঙ্গী ছিলাম। যখন আমরা হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কবর শরীফের মকামে পৌছলাম, তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই স্থানে কারবালার শহীদগণের উট বাধা হবে। এখানে উঠের কাঠি [যেখানে দুজন ব্যক্তি পরস্পর মুখোমুখি বসে] রাখা হবে। এ জায়গায় শহীদদের রক্ত প্রবাহিত হবে। নবী বংশের যুবকরা এ ময়দানে শহীদ হবে। আসমান যমীন তাদের শাহাদাতের উপর কান্নাকাটি করবে।

◆ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় হযরত আলী মুরতাদা এবং জালীলুল কদর সাহাবাগণ কারবালা প্রান্তরের প্রতিটি রন্ধ্র সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তারা জানতেন কোথায় উট বাঁধা হবে? কোথায় সামান (মালপত্র) রাখা হবে? কোন স্থানে রক্ত প্রবাহ হবে। এটিই তো শাহাদাতের পূর্ণতা যে, পূর্বেই এর প্রকাশ্য ঘোষণা এসেছে। সমস্ত গোপনীয়তা সম্পর্কে জানা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের নাম বলে দেয়া হয়েছে। শিশিতে কারাবালার মাটি রাখা হয়েছে এবং তা রক্তে পরিণত হবার জন্য অপেক্ষা করা হয়েছে। সর্বোপরি শাহাদাতের কামনা থেকে সরে না এসে বরং প্রাণ কুরবান দেবার প্রতি দিন দিন জযবাহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত এটিই মর্দে কামেল ও আলে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রাপ্য হিস্যা এবং তাদেরই বীরত্ব।

যদি ইমাম পাকের স্থলে কোন পাহাড়ও হতো, তবে ভয়ে ভেঙ্গে পড়তো। জীবনের এক একটি মূহুর্ত অতিক্রম করা মুশকিল হয়ে যেতো। কিন্তু খোদার সন্তুষ্টি কামনায় মত্ত ইমাম পাক মাওলার রেযামন্দিতে নিজেকে সর্পে দিয়েছেন। এ কুরবাণীর মধ্যেই ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশান্তি আর হাক্কীকী সুখ সমৃদ্ধি নিহিত ছিল। কোন ভীতি-পেরেশানী তার কাছে স্থান পায়নি। কখনো এ মহা-সংকট থেকে মুক্তির জন্য দোআও করেননি বরং আগ্রহের সাথে অপেক্ষার প্রহর গুনেছেন আর নির্ধারিত সময়ের জন্য উদগ্রীব থেকেছেন।

শাহাদাতের ঘটনা সমূহ

নাপাক ইয়াযিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

খুবই বদনসীব ব্যক্তি ছিলো ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়াহ আবু খালিদ উমবী। যার কপালে ছিলো আহলে বায়তে কিরামকে শহীদ করে দেয়ার মতো কালো দাগ। প্রতি যুগে ইসলামী দুনিয়া যার উপর নিন্দার ঝড় তোলে যাচ্ছে এবং হাশর পর্যন্ত যার নামকে ঘৃনার সাথে উল্লেখ করতে থাকবে।

এ বদ বাতেন অন্ধকার হৃদয়ধারী খান্দানের কলঙ্ক ক্ষণে হিজরী ২৫ সনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ঘরে মাইমুন বিনতে বাখদাল কালবিয়্যাহর গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে। অধিক মোটা, বিশ্রী, অধিক চুলওয়ালা, দুশ্চরিত্র, বদ আখলাক, ফাসিক, পাপিষ্ঠ, মদ্যপায়ী, বদকার, অত্যাচারী, বেআদব ও গোস্তাখ ছিলো সে। তার অপকর্ম ও অসভ্যতার অবস্থা এমন পর্যায়ে ছিলো যে, কালের বড় বড় বদমাশেরও তার তান্ডবে লজ্জা হতো। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ আল গাসিল বর্ণনা দেন, খোদার কসম! আমরা ইয়াযিদের উপর তখন চটে গিয়েছিলাম যখন আমাদের মনে হতে লাগলো তার কুকর্মের কারণে আসমান থেকে না আবার পাথর বৃষ্টি নেমে আসে (ওয়াকিদী)। নিষিদ্ধ নারীদের বিয়ে করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি অবৈধ কাজকে সে প্রকাশ্যে বৈধ প্রথা বলে ঘোষণা দেয়। মদীনায়ে তাইয়্যেবাহ ও মক্কায়ে মুকাররমার লাঞ্চনা করে। এমন ব্যক্তির হুকুমত নেকড়ের দেখভাল থেকেও বিপদজনক। যুগের জ্ঞানী-গুনী ও সূফীবাদীরা তার শাসনামলে শংকিত ছিলো। ঠিক এমন সময় রাজত্বের নেতৃত্ব তার হাতে এসে গেলো।
৫৯ হিজরীতে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দোআ করে ছিলেনা-

اللهم انى اعوذبك من رأس الستين وأمارة الصبيان

আল্লাহুমা ইন্নি আউযুবিকা মিন রাসিস সিত্তিনা ওয়া ইমারাতিস সিবয়ান। হে আল্লাহ ষাট হিজরীর আরম্ভক্ষণ এবং অনুপযুক্তের শাসন থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। এ প্রার্থনা থেকে বুঝা যায়। গোপনভেদ'র উম্মোচনকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জানা ছিলো যে, ৬০ হিজরী হবে অযোগ্য ব্যক্তির শাসনকাল ও ফিতনার সময়কাল। বাস্তবে তার সে দোআ কবুল হয়েছে। আর তিনি ৫৯ হিজরীতেই মদীনায়ে পাকে ইন্তিকাল করেছেন।

◆ রুয়ানী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে হাদীসের সারকথা এই যে, আমি হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে শুনেছি। নবীজী ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত রীতি-নীতি পাল্টে দেবে সে হবে উমাইয়া গোত্রের লোক। যার নাম হবে ইয়াযিদ।

◆ আবু ইয়া'লা (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হযরত আবু ওবাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম থাকবে কিন্তু বনী উমাইয়ার এক লোক সর্বপ্রথম ফিতনা-ফাসাদ ও যুলুমের প্রতিষ্ঠাকারী হবে যার নাম হবে ইয়াযিদ (এটি যয়ীফ হাদীস)

আমিরে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ওফাত এবং ইয়াযিদের সালতানাত

হিজরী ষাট সনের রজব মাসে মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দামেশক্বে ওফাত প্রাপ্ত হন। তার কাছে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেশ কিছু তাবাররুকাত ছিলো। চাদর শরীফ জামা মুবারক, চুল মুবারক, কর্তিত নখ মুবারক ইত্যাদি। তিনি ওসিয়ত করে ছিলেন যে, নবীজির চাদর মুবারক, জামা মুবারক যেনো তার কাফনের সাথে দেয়া হয় আর শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যেঙ্গ দিয়ে সাজদাহ করা হতো সে স্থানে যাতে চুল মুবারক ও নখ মুবারক রাখা হয়। সর্বশেষ করুণাময়ের করুণার উপর যেনো তাকে দাফন করা হয়।

বক্র হৃদয়ের ইয়াযিদ দেখতে পেলো যে তার পিতা আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার তাবার্রুকাতের প্রতি এবং দেহ মুবারকের স্পর্শে ধন্য হওয়া কাপড় মুবারকের প্রতি নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভক্তি রাখতেন, জীবনের আখেরী নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধন দৌলত, ঐশ্বর্য এবং হুকুমাত থেকেও বেশী প্রিয় জানতেন, এমনকি বিদায় বেলায় সে অমূল্য সম্পদগুলো সাথে নিয়ে যাবার কামনা করতেন। তিনি মনে করতেন, নবীজীর এ তাবার্রুকাত গুলো দ্বারা তার কাফন মাহবুবের খুশবুতে সুগন্ধময় হবে। অন্ধকার কবরে এ অমূল্য ধনগুলো তার জন্যে প্রিয় সঙ্গী হবে আর একাকীত্বের জন্য পরম বন্ধু হবে। তিনি এও মনে করতেন যে, মহান আল্লাহ স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার লিবাস মুবারকের সাদ্বকায় তার উপর করুণা বর্ষন করবেন। নাপাক ইয়াযিদের উচিত ছিলো, পিতার এ অকৃত্রিম মুহাব্বাত থেকে শিক্ষা নেয়া যে, হুযুর আকা আলাইহিস সালামের শরীর মুবারককে ছুঁয়ে যাওয়া একখানা কাপড়কে এমন মর্যাদাবান করে দিতে পারে, তো যে "হাসনাঈন কারীমাঈন" আলে রাসুল-যাদের শরীর মুবারক স্বয়ং নবীজীর শরীর মুবারকের অংশ, তাদের মরতবা-মর্যাদার কী হালত হতে পারে এবং নবী বংশকে সম্মান করা কতটুকু প্রয়োজন হতে পারে? কিন্তু বদনসীবী আর দুভার্গ্যের কী কোন চিকিৎসা হতে পারে।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর 'ইয়াযিদ' তখতে সালতানাতে আরোহন করে। তার বায়আত নেবার জন্য রাজ্যের সর্বত্র লিখিত পয়গাম জারী করলো। মদীনাহ তাইয়্যেবার গভর্ণর যখন ইয়াযিদের বায়আত নেবার পয়গাম নিয়ে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হাযির হয়, তো ইমাম পাক ইয়াযিদের অন্যায় ও নির্যাতনের কারণে তাকে অযোগ্য বলে ঘোষণা দিলেন। তার বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। একইভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু অস্বীকৃতি জানান।

হযরত ইমাম জানতেন যে, বায়আত অস্বীকার করার কারণে আগুন জ্বলে উঠবে এবং বদকার ইয়াযিদের দুশমনি আর রক্তের পিপাসাও তীব্র হবে। কিন্তু ইমামের পাকের 'ইমানের দৃঢ়তা ও পরহেযগারী' প্রাণ বাঁচাবার জন্য অযোগ্য-পাপীষ্টের হাতে বায়আত কবুলের অনুমতি দেয়নি। তাছাড়া নবী-দৌহিত্রের পক্ষে কি করে সম্ভব! মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করে দেয়া! শরীয়তের বিধি-বিধানকে জলাঞ্জলি দেয়া, প্রিয় নানাজানের দ্বীনকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়া? এ কথা সত্য যে, যদি ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেদিন ইয়াযিদের বায়আতকে স্বীকৃতি দিতেন তবে ইয়াযিদ তাকে অন্তহীন সম্মান জানাতো। মর্যাদার আসীনে সমাসীন করতো। শান্তি-সমৃদ্ধি, নিরাপত্তার অভাব হতোনা। নয় বরং ধন-দৌলতের সমাহার তার কদমে কুরবান করে দেয়া হত। বিনিময়ে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত শৃংখলা লন্ডভন্ড হয়ে যেতো। দ্বীনের অভ্যন্তরে এমন ফাসাদের জন্ম হতো, যা বিদুরিত করা দুষ্কর হয়ে পড়তো। নাপাক ইয়াযিদের কুকর্মকে বৈধতা দেবার জন্য ইমামের বায়আত গ্রহণ 'সনদ' হয়ে যেতো। ইসলামী শরীয়ত তথা বরহক মিল্লাতের নিশানা অস্তিত্ব সংকটে পড়তো।

হে শিয়া সম্প্রদায়! চোখ খোলে দেখ! সে দিন ইমামে পাক নিজেই নিজের জানকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। নিজেকে এমন বিপদ থেকে রক্ষা করবার কথা একটি বারের জন্যও তিনি ভাবেননি। যদি ঐ সংকটাপন্ন সময়ে নিজের হিফাযতকে বৈধ মনে করা হতো, তবে নিঃসন্দেহে তা নিজেকে মোক্ষম সময় ছিলো। হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম বায়াতের দরখাস্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, যদি এ দু'জন বায়আত মেনে নেন তবে সমগ্র মদীনাবাসী ইয়াযিদের অনুসরন করবে। কেউ কোন প্রকার ইতস্ততা ছাড়াই ইয়াযিদকে মেনে নিবে। কিন্তু ইমামে পাক ও ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অস্বীকৃতির কারণে সে অপকৌশল ধুলোয় মিশে যায়। মুলতঃ ইয়াযিদিদের মাঝে এ কারনেই আগুন জ্বলে উঠলো। ফলে ইমামে পাককে প্রয়োজনের তাগিদে ঐ রাতেই মদীনাহ ছেড়ে মক্কায় আসতে হয়। আর এ ঘটনাটি ঘটেছে হিজরী ৬০ সনের শাবান মাসে।

ইমাম পাকের মদীনায় রওয়ানা

মদীনাহ ছেড়ে আসা ছিলো ইমামে পাকের জন্য যেমন কষ্টের-মদীনাবাসীর জন্যও ছিলো বড়ই দুঃখের। মুসলিম উম্মাহ যেখানে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে পবিরার ও প্রিয়জনের মায়া ছেড়ে মদীনাহ অভিমুখে ছুটে চলে। সে জায়গায় মদীনা ওয়ালার দৌহিত্রকে মদীনা ছেড়ে ছুটতে হলো মক্কা অভিমুখে। দরবারে মুস্তফায় হাযেরী দেবার জন্য যেখানে হাযারো কষ্ট সহ্য করে জল ও স্থলের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভয়ানক সফরকে কবুল করে নিতে আশেককে ব্যাকুল করে তোলে। সে জায়গায় ঐ দরবারের লখতে জিগার নুরে নযরকে মদীনাহ ত্যাগে বাধ্য করেছে। বিচ্ছেদের প্রতিটি ক্ষণ ইমামে পাককে যেনো যন্ত্রনায় জজর্রিত করে তুলছে। ফরযন্দে রাসুলেকে স্বীয় নানাজানের নৈকট্য ছাড়তে চাপ সৃষ্টি করেছে। এ বেদনা-বিদুর দৃশ্য ইমামে পাকের হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে। শেষ বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে ইমামে পাক যখন নবীজীর রওজা শরীফে হাযির হলেন। দুই নয়ন বেয়ে অশ্রুবর্ষন আর থামছেনা। ক্ষত বিক্ষত হৃদয় ছিল বিচ্ছেদের যাতনায় পূর্ণঘায়েল। প্রিয় নানা জান আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রওজায়ে আকদাস ত্যাগ করতে হবে, সে উৎকণ্ঠা তার হৃদয়কে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিতে লাগলো। না জানি মদীনাহ বাসীর অবস্থা কেমন ছিলো? যে দৌহিত্রের সাক্ষাতে দীদারে হাবিবের প্রেমিকরা ভঙ্গুর হৃদয়কে প্রশান্ত করতো, যার দীদার পাওয়া ছিল মদীনাহবাসীর হৃদয়ের সুখ-সমৃদ্ধি, আজ অন্তরের সে ঠান্ডাকরণ মদীনাহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। পেরেশান দিল আর অসীম দুঃখ নিয়ে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অবশেষে মদীনাহ থেকে মক্কায় এসে অবস্থান করলেন।

ইমামের কাছে কুফাবাসীর দরখাস্ত

ইয়াযিদ বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম-ইয়াযিদের পক্ষে বায়াত নেবার কী আপ্রাণ চেষ্টা! ফলে শামবাসীর মধ্যে যেখানে ইয়াযিদের তখতগাহ ছিলো, ওখানকার লোকেরা ইয়াযিদকে সমর্থন দিলো এবং তার বায়আতও মেনে নিলো। কুফার অধিবাসীরা হযরত আমীরে মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আমল থেকেই হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিদমাতে দরখাস্ত প্রেরণ করে আসছে। কুফায় আগমনের আবেদন করে যাচ্ছে। কিন্তু ইমামে পাক বরাবরই না আসার সিদ্ধান্তে ছিলেন। হযরত আমীরে মুআবিয়াহর ওফাতের পর তৎপুত্র "ইয়াযিদ তখত নশীন" হবার পর সমগ্র ইরাকের লোক একত্রিত হয়ে ইমাম পাকের কাছে আবারো দরখাস্ত পাঠাতে লাগলো। দরখাস্তে ইরাকবাসী হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অগাধ ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার প্রকাশ করেছে। এমনকি ইমামে পাকের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করবার চরম আগ্রহও দেখিয়েছে।

এভাবে আবেদন পত্র পাঠানোর সিলসিলাহ অব্যাহত থাকে এবং সমূহ গোত্রের তরফ থেকে প্রায় দেড়শটি মত আবেদন নামা হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিদমাতে পৌছানো হয়। কয়টি দরখাস্ত উপেক্ষা করা যায় বলুন তো? কিংবা কতো দিন ইমামে পাকের "তবিয়ত" লাজাওয়াবের অনুমতি দিয়ে যাবে? নিরুপায় হয়ে ইমামে পাক শেষতক নিজের চাচাত ভাই হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কুফায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। যদিওবা পূর্ব থেকে সায়্যিদুনা ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের খবর চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং কুফাবাসীর বেওফায়ী সম্পর্কে থেকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিলো, কিন্তু ইয়াযিদের বাদশাহ হওয়া আর তার সালতানাত দ্বীনের জন্য ভয়ানক হওয়া ছিল মূখ্য বিষয়। মূলত এ কারণেই তার বায়আত গ্রহণযোগ্য ছিলনা। ইয়াযিদ বহু অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে কামনা করতো, লোক তার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করুক। তার অনুসরন করুক। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইয়াযিদের বায়আত থেকে কুফার আকাঙ্খিত জাতির পক্ষে সম্পর্কেচ্ছেদ করা এবং হযরত ইমামে পাকের বায়আতের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হওয়া অবশ্যক হয়ে পড়ে। এদিকে ইমামে পাকের জন্য লাযিম ছিলো যে, তাদের আবেদন কবুল করা। কারণ যখন কোন জাতি যালিম ও ফাসিকের বায়আতের উপর অসন্তুষ্ট থাকে এবং প্রকৃত হকদারের কাছে বায়আতের জন্য আবেদন করে এ অবস্থায় যদি তিনি তা কবুল না করেন, তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তিনি সে জাতিকে একজন যালিমের হাতে সোর্পদ করতে চায়ছেন। সংকটাপন্ন সে সময়ে যদি ইমামে পাক তাদের দরখাস্ত কবুল না করতেন, তাহলে ইমামে পাক মহান আল্লাহর দরবারে কুফাবাসী প্রেরিত এমন আবেদনের কীইবা জওয়াবদিহিতা করতেন? আহলে কুফা তখন বলত, আমরা ইমামে পাকের বায়আত নেবার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্ঠা আর আবেদন করেছি কিন্তু ইমামে পাক কোন ভাবেই আমাদের আবেদনে সাড়া দেননি। ফলে ইয়াযিদের যুলুম-নির্যাতনের তিক্ততায় পড়ে তার বায়আত নিতে বাধ্য হয়েছি। অথবা ইমাম যদি আমাদের দিকে তার দস্তে মুকাদ্দাসা বাড়াতেন, তো আমরা তাঁর জন্য আমাদের প্রাণ বির্সজন দিতাম। (তখন ব্যাপারটি এমন করে বলার অবকাশ থাকত) কিন্তু কোন উপায় ছিলনা। ইমাম পাক সবকিছু ভেবে চিন্তে কুফাবাসীর দাওয়াত কবুল করে নিলেন। তাদের আহবানে 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দিলেন। কিন্তু সিনিয়র সাহাবাদের অনেকে যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের, হযরত আবু সাঈদ, হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী প্রমূখ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এ সিদ্ধান্তে ঐক্যমতে আসেননি। তারা 'ওয়াদার বরখেলাফকারী' কুফাবাসীর আহবানে সাড়া দেয়া মেনে নিতে পারেননি। ইমামে হুসাইনের ভালোবাসা এবং শাহাদাতের প্রসিদ্ধি তাদের হৃদয়ে ভিন্ন মতের সৃষ্টি করেছে। আবার এ মানতে পারছেন না যে, এখনই ইমামের শাহাদাত সংঘটিত

হবে। কারণ শাহাদাত সংঘটিত হবার মতো পরিস্থিতি তখনও তৈরি হয়নি। কিংবা এ সফরেই সে পর্যায় নেমে আসবে, তাও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিলো। মূলতঃ ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ঐ সময় এ পন্থা ছিল যে, এক দিকে জলীলুল কদর সিনিয়র সাহাবাদের অসন্তোষ, অন্যদিকে কুফাবাসীদের আবেদন, এ দুটোর মাঝে সমাধান কল্পে 'ওযরে শরয়ী' বা শরীয়ত প্রবর্তিত কোন কৌশলের অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধানে তিনি কুফাবাসীকে ফিরিয়ে দেবার কোন 'ওযরে শরয়ী' গ্রহণ করলেন না। যদিও সিনিয়র সাহাবাগণ এ ব্যাপারে একমত নন। মোদ্দাকথা ইমামে পাকের জন্য এ মাসআলাটি ছিলো বেশ মুশকিলের। অতএব এ মাসআলার সমাধানে তিনি প্রথমে হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় খোঁজে পেলেননা। তিনি প্রাথমিক ভাবে দেখতে চেয়েছেন যদি কুফাবাসী তার সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং বে-ওফায়ী করে তাহলে 'ওযরে শরয়ী' মিলে যাবে আর যদি তারা তাদের অঙ্গিকার রক্ষা করে তাহলে সাহাবায়ে কিরামকে শান্ত করা যাবে। অর্থাৎ ইমামে পাক চাচাত ভাই হযরত মুসলিমকে কুফাবাসীর ঐ অবস্থার সত্যতা জানার জন্য প্রেরণ করেছেন- চিঠির মাধ্যমে যে ভালবাসা ও বায়আতের কথা তারা জানিয়েছিল, যদি এ দাবীতে তারা হযরত মুসলিমের সাথে সত্যবাদী হয়, তবে সাহাবীদের হৃদয় প্রশান্ত হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সেখানে না যাওয়ার বিষয়ে শরীয়ত সম্মত পথ উম্মোচন হবে।

হযরত মুসলিমের কুফা রওয়ানা

উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কুফাবাসীর কাছে চিঠি লিখে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের আহবানের প্রেক্ষিতে আমি হযরত মুসলিমকে তোমাদের কাছে পাঠালাম। তাকে সহযোগিতা করা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমাদের উপর আবশ্যক। হযরত মুসলিমের প্রাণপ্রিয় সন্তান হযরত মুহাম্মদ এবং হযরত ইব্রাহিমও তার সফর সঙ্গী হলেন। হযরত মুসলিম ইবনে আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফায় পৌছে মুখতার ইবনে ওবাইদের ঘরে অবস্থান নিলেন। তার আগমনের সংবাদ শুনে দলে দলে মানুষ তার সাক্ষাতের আসতে শুরু করলো এবং বারো হাজারের অধিক লোক তার পবিত্র হাতে হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বায়আত গ্রহণ করলো।

হযরত মুসলিম ইরাকবাসীর যারপর নাই আগ্রহ ও ভালোবাসা দেখে ইমামে পাকের নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন। চিটিতে ইরাকবাসীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিলেন এবং ইমামে পাকের কাছে আবেদন রাখলেন যে-হযরত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি এখানে তাশরীফ রাখুন। যাতে ইরাকের মুসলমানগণ নাপাক

ইয়াযিদের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকে আর দ্বীন-এ হক্বের ভিত্তি যেন আরো মজবুত হয়। মুসলিম মিল্লাত যেনো ইমামে পাকের বায়আত গ্রহণে ধন্য হতে পারে। কুফাবাসীর এমন তরঙ্গ দেখে শাম হুকুমাতের পক্ষ হতে নিযুক্ত কুফার গর্ভনর নু'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেন ইয়াযিদ যেহেতু এ বায়আতের বিপক্ষে সুতরাং সে অবশ্যই এ কাজের উপর চটে যাবে। শুধুমাত্র এতটুকু জানান দিয়ে নিয়ম রক্ষা পূর্ণ করে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং এ কাজে কোন ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসার করলেননা।

ইয়াযিদকে সংবাদ জ্ঞাপন

মুসলিম ইবনে ইয়াযিদ হাদ্বরামী ও আম্মারাহ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে ওকবাহ ইয়াযিদের নিকট সংবাদ দিলো যে, হযরত মুসলিম ইবনে আক্বীল তাশরীফ এনেছেন। কুফাবাসী তার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ঢেউ তুলে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ তার হাতে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বায়আতও নিচ্ছে। এদিকে নু'মান ইবনে বশীর তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন কানুনগত ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি তাদের এ কাজে সে বাঁধা প্রদানও করেনি।

ইবনে যিয়াদকে গর্ভনর নিয়োগ ও তার প্রতারণা

ইয়াযিদ এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই হযরত নু'মান ইবনে বশীরকে বরখাস্ত করলো এবং বসরার গভর্ণর ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করলো। ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিলো চরম প্রতারক আর ষড়যন্ত্রকারী। সে দেরী না করে বসরা থেকে রওয়ানা দেয়। নিজের ফৌজকে (বাহিনী) কাদেসিয়্যাহ হতে ছেড়ে দিয়ে হিজাযীদের পোষাক পরিধান করে উঠের উপর আরোহন করে সঙ্গে কিছু লোককে সফর সঙ্গী বানিয়ে রাতের সূচনালগ্নে ইশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে কুফায় প্রবেশ করে। ঠিক যে বেশে হিজাযের কাফেলা প্রবেশ করে, সে বেশেই ইবনে যিয়াদ কুফায় আগমন করলো। তার এ ধোঁকাবাজির লক্ষ্য ছিলো কুফাবাসী বর্তমানে খুবই জযবার হালতে রয়েছে। তাই তাকে যেনো তারা চিনতে না পারে বরং এমন মনে করে যে, স্বয়ং ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাশরীফ এনেছেন। যাতে সে কোন প্রকার ঝুঁকি ছাড়া নিরাপদে কুফাতে প্রবেশ করতে পারে। বাস্তবে তাই হয়েছে। কুফাবাসী যার আগমনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর গুনে চলছে, তারা আজ প্রতারিত হলো। রাতের অন্ধকারে হিজাযী পোষাক এবং হিজাযের পথ ধরে আসতে দেখে ভেবেছিলো, এই বুঝি ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আগমন হলো। সঙ্গে সঙ্গে না'রা-শ্লোগানে উচ্ছসিত জনতার আওয়ায বুলন্দ হয়ে উঠেছে। সমস্বরে সকলে মারহাবা বলতে বলতে অর্ভ্যথনা জানাতে লাগলো "مرحبابك يا ابن رسول الله" قدمت خير مقدم" (মারহাবান বিকা ইয়া ইবনা

রাসুলিল্লাহ এবং কুদিমতা খাইরা মাক্বদামিন)'র শোরগোল পড়ে গেলো। এসব শুনে অবাধ্য-ছদ্মবেশী ইবনে যিয়াদের অর্ন্তদহন শুরু হয়ে যায় এবং সে অনুমান করতে পারলো যে, কুফাবাসী ইমামে পাকের আগমনের প্রতি কতটা উদগ্রীব হয়ে আছে! তাদের হৃদয়গুলো তার দিকে কী পরিমাণ ঝুঁকে পড়েছে! এ অবস্থায় ইবনে যিয়াদ নিরবে অগ্রসর হতে লাগল। সে কিছুই বললোনা, যাতে তার প্রতারণার কথা কেউ বুঝতে না পারে। শেষ পর্যন্ত সে দারুল ইমারাহ বা গভর্ণমেন্ট হাউসে যখন প্রবেশ করলো, কুফাবাসী বুঝতে পারল যে, ইনি হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নন। বরং ইবনে যিয়াদই ধোঁকার ছলে কুফায় প্রবেশ করেছে অতপর তাদেরকে হতাশ করেছে।

ইবনে যিয়াদের ঘোষণা

রাত অতিক্রম হতেই সকাল সকাল ইবনে যিয়াদ কুফাবাসীকে সমবেত করে হুকুমাতের পরওয়ানা শুনিয়ে ঘোষণা দিলো যে, তোমরা ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করোনা। তার বিপক্ষে অবস্থান নিওনা। যদি এমনটা হয়, তবে এর পরিনাম ভালো হবে না। ভিন্ন ভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সে হযরত মুসলিম ইবনে আকীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সংঘটিত দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো।

হযরত মুসলিমের হানীর ঘরে অবস্থান ও হানীর গ্রেপ্তার

সংঘবদ্ধ জনতার বিচ্ছিন্নতা দেখে হযরত মুসলিম হানী ইবনে উরওয়াহর ঘরে অবস্থান নিলেন। ধূর্ত ইবনে যিয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আশআসার নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল হানীর ঘরে প্রেরণ করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। অতঃপর জেলে প্রেরণ করে। সমূহ কুফার শীর্ষস্থানীয়দেরকেও নযরবন্দী করা হয়।

ইমাম মুসলিম কর্তৃক গভর্ণর হাউস ঘেরাও

গ্রেফতারের সংবাদ শুনে হযরত মুসলিম বের হয়ে পড়লেন। কুফার অধিবাসীদের আহবান দিলেন। তার আহব্বান শুনে দলে দলে জনতার ভীড় বাড়তে লাগল। এমনকি চল্লিশ হাজারের সমবেত জনতা ইমাম মুসলিমের সাথে শাহী ভবন ঘেরাও করে নেয়। উত্তেজিত জনতার এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, শুধুমাত্র হামলা করাটাই বাকী ছিলো। যদি ইমাম মুসিলম সে দিন হামলা করার আদেশ দিতেন, তো ঐদিনই গভর্ণর হাউস দখল করে বিজয় অর্জন করতে পারতেন। ইবনে যিয়াদ ও তার সঙ্গীরা ইমাম মুসলিমের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যেতো। এ জনতার ঢল চাইলে সেদিন শামীদের লন্ডভন্ড করে দিতে পারত। আর তখন ইয়াযিদ প্রাণ বাঁচানোর রাস্তাও খোঁজে পেতনা। কিন্তু খোদা তাআলার প্রকৃত বান্দাদের ভাবনা কেমন হয় দেখুন। হযরত মুসলিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুতো কিল্লআহ বেষ্টন করে নিয়েছেন। বিজয় অর্জন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। অপরদিকে কুফাবাসীর ওয়াদা ভঙ্গ করা, ইবনে যিয়াদের প্রতারণা ও ইয়াযিদের দুশমনিও পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ হয়েছে। এতদসত্ত্বেও হযরত মুসলিম ও তার বাহিনীকে হামলা করার আদেশ দেননি বরং একজন সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অপেক্ষা করেছেন এই ভেবে যে, অন্তত প্রাথমিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করা যাক! মীমাংসার রাস্তা তৈরি করা যাক। যাতে মুসলমানের মাঝে অহেতুক রক্তক্ষরণ না হয়। তিনি পবিত্র এ ইচ্ছা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আর সর্তকতাকে নিজের হাত ছাড়া হতে দিলেন না। কিন্তু শত্রুপক্ষ এ নীরবতা থেকে পরিপূর্ণ ফায়েদা উঠালো। নযরবন্দীতে থাকা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে বাধ্য করা হলো। যেনো তারা হযরত মুসলিমের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কতবড় বিশ্বাসঘাতকতা! ইবনে যিয়াদের হাতে বন্দি থাকা মানুষগুলো ধারণা হলো যে যদি ইবনে যিয়াদের ক্ষতিও হয় তারপরও সে কিলআহ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে শেষ করে দিবে। এ শংকা থেকে তারা ঘাবড়ে গিয়ে কিলআহর দেয়ালের উপর দিয়ে চড়ে তাদের পরিচিত ও স্বজনদের সঙ্গে আলাপ সেরে নেয়। স্বজনরা হযরত মুসলিমের সঙ্গ ছাড়তে তাদেরকে বাধ্য করে আর এই বলে ভয় দেখায় যে, হুকুমাত তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে। নাপাক ইয়াযিদ তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে। তোমাদের ধন-দৌলত, বাড়ী-ভিটে লুটে নিবে। তোমাদের জায়গা ও জমি জব্দ হয়ে যাবে। যা হবে ভয়াবহ পরিণতি। যদি তোমরা ইমাম মুসলিমের সঙ্গ না ছাড়ো তবে আমরা ইবনে যিয়াদের জেলের অভ্যন্তরে মারা পড়বো। স্বীয় পরিণতির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করো। আমাদের উপর দয়া করো। আর নিজেদের ঘরে ফিরে যাও।

ইবনে যিয়াদের অপকৌশল বাস্তবায়ন হলো।

অবশেষে ইবনে যিয়াদের অপ-কৌশল সফল হলো। হযরত মুসলিম ইবনে আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যরাও বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো। এমনকি সন্ধেবেলায় মাগরিবের নামাযের প্রারম্ভে মসজিদে কুফায় যেখানে পঞ্চাশ জন লোক ছিলো, সেখানে নামায শেষ না হতেই তা শূন্যের কৌটায় উপনীত হয়। অতি উৎসাহ আর প্রার্থনার মাধ্যমে যে প্রিয় অতিথিকে আহবান করেছিলো- তার সঙ্গে একেমন বিশ্বাসঘাতকতা যে, তিনি আজ বড়ই একা। তাকে সঙ্গ দেবার মতো কেউই রইলোনা। কুফাবাসী ইমাম মুসলিমকে ত্যাগ করার পূর্বে লজ্জা-শরমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং বিন্দু পরিমান পরওয়া করলোনা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে তাদের এ ভীতু স্বভাবের জনরব তৈরি হবে। তাদের কাপুরুষতার কারণে গোটা জাহানে তাদের লাঞ্ছনা হবে সে কথাও ভাবলনা। হযরত মুসলিম একাকীত্ব ও মুসাফির হালতে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লেন। কোথায় যাবনে? কোথায় উঠবেন ভেবে পাচ্ছিলেননা। কুফার সমগ্র মেহমান খানার দরজা আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এমন সম্মানিত মেহমানকে অভিবাদন জানাবার জন্যে কদিন পূর্বেও দূত

প্রতিনিধিরা কাতার বেঁধেছিলে। তারা আজ কোথায়? অবুঝ বাচ্চা সাথে নিয়ে কোথায় ফিরবেন? কোথায় গুর্জবেন? বিস্তৃত কুফার বিশাল সীমানায় দু'চার গজ জায়গাও রাত পোহাবার জন্য তার নজরে আসছেনা এমন সময় হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথা তার মনে পড়ে যায়। হৃদয় তার অস্থির হয়ে উঠে। তিনি ভাবলেন, আমিতো ইতোমধ্যেই ইমামে পাকের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। তাকে কুফায় আসার জন্য আবেদনও করেছি এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী কুফাবাসীর ইখলাস ও ভালোবাসার মনমাতানো নকশাও পেশ করেছি। এমনকি তাশরীফ আনবার জন্য তাগাদাও দিয়েছি। নিশ্চয় হযরত ইমাম হুসাঈন আমার আবেদন ফিরিয়ে দেননি। প্রশান্ত হৃদয়ে হয়তো তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হুয়ে গিয়েছেন। এখানে এসে পড়লে তাকে কতইনা মুসিবতের শিকার হতে হবে। পাষান কুফীদের বর্বরতা ফাতিমা কাননের জান্নাতি ফুলগুলোকে কতোইনা কষ্ট দেবে। এই দুশচিন্তা মুসলিমের হৃদয়কে ঘায়েল করে নিয়েছে। প্রেরিত চিঠির কথা ভেবে লজ্জায় ভেঙ্গে পড়লেন-অনুতপ্ত হলেন। ইমামে পাকের দিকে ধেঁয়ে আসা বিপদের শংকা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

হযরত মুসলিমের শাহাদাত

করুন এ অবস্থায় হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ সম্মুখপানে একটি ঘর তার দৃষ্টিগোচর হলো। 'তাওআহ' নামের এক মহিলা ওখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত মুসিলম তার কাছে পানি চাইলে মহিলাটি নবী বাগানের এ প্রতিনিধিকে চিনতে পেরে তাকে পানি এনে দিলেন। নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করে তিনি তার ঘরে হযরত মুসলিমকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু মহিলাটির পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আশআস ছিলো ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর। খুশিমনে ছেলেকে এ ব্যাপারে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সে ইবনে যিয়াদকে ইমাম মুসলিমের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কুফার কোতোয়াল (রক্ষক) ওমর ইবনে হারিস এবং মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে মহিলাটির ঘরে প্রেরণ করে। উক্ত দু'জনের নেতৃত্বে একটি দল তাওআহর ঘর ঘিরে ফেলে। তারা চেয়েছিলো হযরত মুসলিমকে গ্রেপ্তার করতে কিন্তু তাদের আগমনের আছ করতে পেরে হযরত মুসলিম তলোয়ার হাতে বের হয়ে পড়লেন এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে ঐ যালিমদের সঙ্গে মুকাবিলা শুরু করলেন। শত্রু পক্ষ দেখতে পেলো যে, হযরত মুসলিম জালিমদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেমনটা বনের দুঃসাহসী বাঘ নিরীহ গরু-ছাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার এ সাহসপূর্ণ হামলার কারণে বাহাদুর সৈন্যের অন্তর ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। মনস্তাত্বিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের অনেকগুলো লোক মারাত্মক যখমও হয়। তারা বুঝতে পারে যে, বণী হাশিমের একজন মাত্র যুবকের সাথে কুফার এ ভীতু লোকগুলো কোনভাবেই জয়লাভ করতে পারবেনা। কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন। যেকোন মূল্যে হযরত মুসলিমকে কাবু করার চেষ্টা করতে হবে। এ ভাবনা থেকে ইবনে যিয়াদ বাহিনী ইমাম মুসলিমকে শান্তি ও মীমাংসা প্রস্তাব দেয়। হযরত মুসলিমের কাছে আরয করে যে, আমাদের আর আপনার মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন নেই। আমরা আপনার সঙ্গে লড়তে চাইনা। আবেদন শুধু এইটুকু-আপনি অন্তত একবার ইবনে যিয়াদের কাছে তাশরীফ রাখুন এবং তার সাথে আলোচনায় বসুন আর মীমাংসার ফায়সালা করুন। অন্যদিকে হযরত মুসলিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও বললেন, আমি নিজেরও যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নিয়ে কুফায় আসিনি। এমনকি যে সময় আমার সাথে চল্লিশ হাজার সৈন্য বাহিনীর বিশাল বহর ছিলো তখনও যুদ্ধ করিনি বরং আমি অপেক্ষায় ছিলাম এই ভেবে- ইবনে যিয়াদ অবশ্যই মীমাংসার পথ খোঁজে বের করবে। রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষও বন্ধ হয়ে যাবে। অতপর সহজ-সরল হযরত মুসলিম তার দুই সাহিবযাদাকে সাথে নিয়ে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর সঙ্গে গভর্ণর হাউসের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মুনাফিকতো মুনাফিকই। এরা বড়ই দুরাচার-দুর্ধষ। মুনাফিক ইবনে যিয়াদ প্রথম থেকেই প্রাসাদের দু'দরজার দু'পাশের অভ্যন্তর থেকে তলোয়ার ধারী দু'জন সৈন্যকে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং আদেশ দিয়েছে যে, হযরত মুসলিম দরজায় প্রবেশ করতেই উভয় দিক থেকে যেনো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। হযরত মুসলিম কি জানতেন এ প্রতারণার কথা? তিনি প্রাসাদের মুখে পৌছতেই ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق "রাব্বানা ইফতাহ বায়নানা ওয়া বায়না ক্বাওমিনা বিলহাক্বী" এ আয়াতে কারীমাহ তিলাওয়াত করতে করতে দরজায় প্রবেশ করবার উপক্রম হলেই পূর্বে থেকে উৎপেঁতে থাকা বদনসীবগুলো তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত শুরু করে দেয়। ফলে বণী হাশেমের মযলুম-মুসাফির হযরত মুসলিম দ্বীনের শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরন করলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মুসলিম পুত্রদ্বয় ও হানীর শাহাদত

হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহুর দুই সাহিবযাদা হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুহাম্মদ পিতার শাহাদাতের সময় তার সাথেই ছিলেন। নির্মমভাবে প্রিয় জন্মদাতার মাথা মুবারক শরীর হতে আলাদা হতে দেখে কোমল মতি এই বাচ্চাদ্বয়ের হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকে তাদের আপাদমস্তক। একভাই অপর ভাইয়ের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নয়নভরে অশ্রু ঝরাচ্ছিলেন। বেদনাদায়ক এক্ষণে তাদের উপর করুণা করবার মতো কেউই ছিলোনা। ছিলনা কোন আশ্রয় দাতা। ছিলনা কোন রহম করনে ওয়ালা। যালিম শত্রুরা নির্বিচারে অসহায় বাচ্চাদ্বয়কেও শহীদ করে দেয়। অতপর তারা হানীকেও নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে দেয়। সমূহ শহীদের মস্তক গুলোকে শূলিতে চড়িয়ে কুফার

অলি-গলিতে প্রদক্ষিণ করানো হয়। প্রকৃত পক্ষে এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে কুফাবাসী তাদের অন্তরের গুপ্তে থাকা কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। এ ঘটনাটি ৬০ হিজরী সনের ৩ যিলহাজ্ব মাসের। ঐদিনই হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কা হতে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

পাদটীকাঃ-১ নিম্নোক্ত হযরাতগন ঐ সময় তার সঙ্গে ছিলেন।

তিনজন সাহিবযাদা

১. হযরত ইমামে আলী আওসাত যাকে ইমাম 'যায়নুল আবেদীন' বলা হয়। যিনি হযরত শাহর বানু বিনতে ইয়াযুজ্দ বিন শাহরেয়ার বিন খাসরু পারুয়িয বিন হরমুয বিন নুশিরার গর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হন। ঐ সময়ে তাঁর বয়স ছিলো বাইশ বছর। কারবালার যুদ্ধের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন।

২. হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় আওলাদে পাক হযরত আলী আকবর। যিনি ইয়া'লা বিন আবু মুররাহ বিন ওরওয়াহ বিন মাসউদ সাক্বফীর গর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হন। তার বয়স ছিলো আটারো বছর (তিনি কারবালার যুদ্ধে অবর্তীণ হয়ে শাহাদাত বরন করেন।

৩. ইনি ছিলেন দুধের বাচ্চা হযরত আলী আসগর। যার নাম হলো আবদুল্লাহ এবং জা'ফর। তার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার মাতা বনী ক্বাদআত গোত্রের ছিলেন।

একজন সাহিবযাদী

নাম হযরত সাকিনাহ। যিনি হযরত কাসিমের সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত ছিলেন। ঐ সময় তার বয়স হয়েছিলো মাত্র ৭ বছর। কারবালায় অবতরণকালে তার বিয়ে হয়েছে সংক্রান্ত যে বর্ণনা প্রসিদ্ধি পেয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। এমন কিছু স্বল্প বিবেক সম্পন্ন লোক এ রিওয়ায়াত এনেছে, যাদের কাছে এতটুকু পার্থক্য করার যোগ্যতা নেই। তাদের বুঝা উচিত ছিলো আহলে বাইতের জন্য ঐ সময়টি মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনযোগ শাহাদাতের শাওক (আগ্রহ) ও জীবনের আখেরী ফায়সালা গ্রহণের। এমন দু:সময়ে শাদী আনজামের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছিলো অবস্থার পরিপন্থি। এছাড়া হযরত সাকিনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত শামের পথে হয়েছে সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ বর্ণনাটিও মিথ্যা। বরং কারবালায় মর্মান্তিক ঘটনার পর কিছুদিন পর্যন্ত তিনি অবকাশ পেয়েছেন। পরবর্তীতে তার শাদী হয়েছিলো হযরত মাসআব ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। হযরত সাকীনাহ'র মাতা ইমরুল কায়স ইবনে আদি ছিলেন বণি কালব গোত্রের মেয়ে। ইমাম আলী মকামের বিবিগণের মধ্যে তিনিই ইমাম পাকের কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। তাকে খুবই সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। ইমামে পাকের এক পংক্তিতে তিনি বলেন لعمری انی لاحب ارضا + تحل بها سکینة والرباب এ পংক্তিই প্রমান করে যে, ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাকিনাহ ও তার সম্মানিত মাতাকে কতইনা ভালোবাসতেন। হযরত ইমাম পাকের বড় সাহিবযাদী হযরত ফাতিমা। যিনি হযরত উম্মে ইসহাক্ব বিনতে হযরত ত্বালহার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ সময় স্বীয় স্বামী হযরত হাসান মুসান্না ইবনে ইমাম হাসান ইবনে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মাদীনাহ তাইয়্যোবায় অবস্থান করছিলেন। কারবালায় আসা হয়নি তার।-

ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফা অভিমুখে

হযরত মুসলিম বিন আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রেরিত চিঠি ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি কুফাবাসীর আবেদন কবুল করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা, বৈধ ওযর-আপত্তির অবকাশ গ্রহণ করলেন না। এটাইতো পূর্বে নির্ধারিত সিদ্ধান্তের আসল রূপরেখা। তাই বাস্তবে ধীরে ধীরে সে সিদ্ধান্তের প্রতিফলন হতে চলেছে। কাঙ্খিত শাহাদাতক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। প্রত্যাশিত সে মুহুর্তটির অপেক্ষায় হৃদয় উত্তেজনার সাথে প্রহর গুনছে । জীবন বির্সজনকারীদের জোশ যেনো অন্তরকে উত্তাল করে দিচ্ছিলো। এক দিকে ইমাম আলী মকামের ইরাক সফরের ইচ্ছা, অন্যদিকে আসবাবে সফর বা সফরে বের হবার কারণ সমূহও পাওয়া যাচ্ছিলো। এ যেনো দিবালোকের ন্যায় প্রত্যাশিত শাহাদাতের প্রস্তুতি চলছে। আনুগত্যে ভরপুর পূর্ণ বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ইলহাম হচ্ছে যে, যদিও বাহ্যিকভাবে এ সফরের কোন ভয়াবহতা আপাতত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না এবং হযরত মুসলিমের প্রেরিত চিঠির মাধ্যমে কুফাবাসীর ভক্তি ও দাওয়াত এবং হাযারো জনতার বায়আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংবাদও মিলেছে। ফলে যুদ্ধ সংগঠিত হওবার সুস্পষ্ট কারণ ও ওযর-আপত্তি পাওয়া যায়নি।

- হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিতা বিবিগণের মধ্যে কারবালায় ইমামে পাকের সাথে হযরত শাহর বানু এবং হযরত আলী আসগরের আম্মাজানও সফর সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চার নওজাওয়ান আউলাদে পাক যথাক্রমে হযরত কাসিম, হযরত আবদুল্লাহ, হযরত ওমর ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমও সফর সঙ্গী হিসেবে কারবালায় তাশরীফ আনেন এবং প্রত্যেক শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়া শেরে খোদা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পাঁচ আওলাদ যথাক্রমে হযরত আব্বাস ইবনে আলী, হযরত ওসমান ইবনে আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আলী, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী এবং হযরত জা'ফর, ইবনে আলী ইমামে পাকের সফর সঙ্গী ছিলেন। ইনারাও ময়দানে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। ইমামে পাকের চাচা হযরত আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আউলাদদের মধ্যে হযরত ইমাম মুসলিম তো কারবালায় ইমামে পাকের আগমনের পূর্বেই দুই সাহিবযাদাসহ শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। ইনি ছাড়াও আরো তিনজন লখতে জিগার যথাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ, হযরত আবদুর রহমান ও হযরত জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ইমামে পাকের সঙ্গে কারবালায় আসেন এবং শাহাদাতের সুধা পান করেন।

হযরত জা'ফর তাইয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুইনাতি হযরত মুহাম্মদ ও হযরত আউন ইমামে পাকের সফর সঙ্গী হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। তাদের বুর্যগ আব্বাজানের নাম আবদুল্লাহ বিন জা'ফর। তারা ইমামে পাকের আপন ভাগ্নে হন। তাদের সম্মানিতা আম্মাজান হযরত যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আপন বোন ছিলেন। আহলে বাইতের মোট সতেরো জন সাহিবযাদা ইমামে পাকের সঙ্গী ছিলেন এবং মকামে শাহাদাত লাভ করেন। ইনারা ব্যতিত হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন ছিলেন অসুস্থ এবং ওমর বিন হাসান, মুহাম্মদ বিন ওমর বিন আলী এবং অন্য এক শিশু সাহিবযাদাকে বন্দী করা হয়। ইমামে পাকের বোন হযরত যায়নাব, স্ত্রী হযরত শাহর বানু, কন্যা হযরত সাকীনাহ এবং আহলে বাইতের অন্যান্য বিবিগন তাদের সঙ্গে ছিলেন।

তা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের অন্তর ঐ সময় ইমামে পাকের সফরকে কোন ভাবেই সায় দিতে পারেনি। তারা ইমাম আলী মকামকে না যেতে দেবার অনুরোধে অটল ছিলেন। এমনকি তারা আবেদন করেছিলেন, হে ইমাম! আপনি আপনার এ সফরকে মুলতবি করুন। তদুপরি ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফাবাসীর আবেদনের কারণে মজবুর ছিলেন। কেননা তিনি মনে করেন যে, এতগুলো মানুষের আবদার আর আবেদনকে অগ্রাহ্য করা হবে। আহলে বাইতের শানের পরিপন্থি। তাছাড়া ইমাম মুসলিমের কুফায় পৌছানো এবং তার ব্যাপারে কুফীদের কোন প্রকার অবহেলা না করা, ইমামের পক্ষে বায়আাত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং হাযারো কুফী আহলে বাইতের গুলামীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ঠিক তার বিপরীতে ইমাম আলী মকামের পক্ষ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তাদের আবেদনকে শুধুমাত্র দ্বীনি নিয়ম রক্ষার কারণে নামঞ্জুর করা এবং এ বিশাল মুসলিম জাতির হৃদয়কে খান খান করা- ইমামে পাকের কাছে কোন ভাবেই যর্থাথ মনে হয়নি। তার উপর হযরত মুসলিমের মতো নিষ্কলুস ব্যক্তির আহবানকে বেহুদা মনে করা, তার পক্ষ থেকে আসা দরখাস্তকে ফিরিয়ে দেয়াও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খুবই অসম্ভব ছিলো। দৃশ্যপটটা এমন যে, ইরাক সফরের জন্য তারা ইমাম আলী মকামকে বাধ্য করেছে আর স্বীয় হিজাযী আপনজনদের সাথে ইমামে পাককে আপত্তি করতে হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের, হযরত আবু সাঈদ খুদরী হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসি প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বাধা প্রদানে জোর তাগিদ দিয়েছেন। তাদের সর্বশেষ চেষ্টা ছিলো-ইমাম পাক যেনো মক্কা মুকাররমা ত্যাগ করে না যায়। কিন্তু তাদের সে চেষ্টার কোন ফলন আসেনি। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পরিশেষে হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হিজরী ৬০ সনের ৩ যিলহজ্ব আহলে বাইত ও খাদিম মিলে সর্বমোট ৮২ জনের একটি কাফেলা নিয়ে ইরাকের রাস্তা ইখতিয়ার করলেন। কা'বা ঘরের আখেরী তাওয়াফ করে মক্কায়ে মুকাররামাহ থেকে আহলে বাইতের এ ছোট্ট কাফেলা রওয়ানা হচ্ছিলো এবং এ ধরা থেকে চির বিদায় নিতে যাওয়া লোকগুলো আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করে খানায়ে কা'বার গিলাফ ধরে অঝোরে কান্না করছিলেন। ভঙ্গুর হৃদয়ের আহযারী ও বিগলিত দিলের আর্তনাদের করুন সুর মক্কা অধিবাসীদের পেরেশান করতে লাগলো। আহলে বাইতের কাফেলাকে মক্কা ত্যাগ করতে দেখে মক্কার ছোট ছোট বাচ্চারা যারপর নাই ভেঙ্গে পড়ে ।

বশির ইবনে গালিব'র সাক্ষাত

সেই জানবায সেনাপতি ও প্রাণ কুরবানদাতাদের কাফেলা অদম্য স্পৃহা নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে 'যাতু ইরাকে' বশির ইবনে গালিব'র ঘরে অবস্থান নিলেন। (যিনি মক্কার উদ্দেশ্যে কুফা হতে আসছিলেন)। ইমামে পাক তার নিকট কুফীদের অবস্থা জানতে চায়লেন। বশির ইবনে গালিব প্রত্যুত্তরে বললেন, হে ইমাম। তাদের হৃদয় আপনার সাথে কিন্তু তাদের হাতিয়ার বনী উমাইয়ার সাথে। অতএব মহান আল্লাহ যা চান তাই করেন "يفعل الله ما يشاء" ইমামে পাক বললেন তুমি সত্য বলেছে। এ জাতীয় আলাপ চারিতা কবি ফারাযদাক'র সঙ্গেও হয়েছিলো।

ওবাইদুল্লাহ বিন মু'তির সাক্ষাত

বাতনুর রিমাহ নামক অঞ্চল থেকে রওয়ানা হবার পর ওবাইদুল্লাহ বিন মুতি'র সাথে ইমামে পাকের সাক্ষাত হয়। তিনিতো ইমামে পাকের সফর মুলতবি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং একটি সম্ভাব্য বিপদের আশংকাও করেছিলেন। কিন্তু ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
"لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا" আমাদের উপর সে বিপদই সমাগত যা মহান আল্লাহ আমাদের তাকদীরে লিখে দিয়েছেন।

কুফাবাসীর ওয়াদাভঙ্গ ও হযরত মুসলিমের শাহাদাত সংবাদ

পথিমধ্যে হযরত ইমাম আলী মকাম কুফীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং হযরত মুসলিমের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন। হুসাইনী কাফেলার এবার মতের ভিন্নতা দেখা দেয়। ইমামে পাকতো একবার যাহেরী সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলেন ফিরে যাবার। কিন্তু অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত এ মতটিই প্রাধান্য পেলো যে, সফর বহাল থাকবে। প্রত্যাবর্তনের ধারণা ত্যাগ করতে হবে।

হুর বিন ইয়াযিদের সঙ্গে সাক্ষাত

কুফায় পৌছতে এখনো দুই মনযিল বাকী। ইতিমধ্যেই হুর বিন ইয়াযিদ রবাহীর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তার সঙ্গে ছিলো ইবনে যিয়াদের এক হাজার অস্ত্রধারী সৈন্যদল। হুর ইমামে পাকের কাছে আরয করলো যে, তাকে ইবনে যিয়াদই প্রেরণ করেছে এবং আদেশ দিয়েছে যেনো আপনাকে ইবনে যিয়াদের কাছে নেয়ে যাই। হুর এও বলেছে, হে ইমাম! আমি নিতান্তই অপারগ হয়ে এসেছি। আপনার সামনে এমন স্পর্ধা দেখানো আমার কাছে খুবই অপছন্দের এবং গর্হিত কাজের শামিল। হযরত ইমামে পাক বললেন। হে হুর! আমি স্বেচ্ছায় এ শহরে আসিনি। কুফাবাসীর উপুর্যপুরি বার্তা ও লাগাতার চিঠি প্রেরণের ফলে আমার আগমন হয়েছে। হে কুফার বাসিন্দা! যদি তোমরা স্বীয় ওয়াদার উপর অটল থাকো, বায়আতের উপর স্থির থাকো এবং তোমাদের যুবানের উপর যদি তোমাদের মালিকানা থেকে থাকে, তবেই আমি এ শহরে প্রবেশ করছি নতুবা আমি এখান

থেকে ফিরে যাবো। হুর কসম করে বললো, হে ইমাম! আপনার নিকট আবেদননামা ও চিঠি পৌছানো সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। এখন আমি না পারছি আপনাকে ছাড়তে, না পারছি ফিরে যেতে।

হুরের হৃদয়ে ইমামে পাকের প্রতি-খান্দানে নবুয়াতের প্রতি এবং আহলে বাইতের প্রতি সম্মান ছিলো এমনকি সে নামাযে ইমামের ইকতিদাও করেছিলো বটে। কিন্তু সে ইবনে যিয়াদের হুকুমে মজুবর ছিলো এবং সে আশঙ্কা করেছিলো, যদি সে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনুকুলে কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার সঙ্গে থাকা ইবনে যিয়াদের এক হাজার সৈনিকের কাছ থেকে তা গোপন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়া ইবনে যিয়াদ যদি জানতে পারে যে, ইমামে পাকের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ করা হয়েছে তবে খুবই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। মূলতঃ এ আশঙ্কা থেকে হুর নিজের কথার উপর অটল ছিলো। এমনকি হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শেষতক কুফার পথ ধরে কারবালায় অবতীর্ণ হতে হলো।

কারবালায় অবতরণ

৬১ হিজরী সনের ২ তারিখ। ইমামে পাক স্থানের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন এটিই কারবালা! সুলতানের কারবালা হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কারবালা সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, কারবালাতেই 'আহলে বাইত' খোদার পথে রক্তের নদী ভাসাবে। বীভিষিকাময় সে দিন গুলোতে ইমাম পাক নানাজান আক্কা আলাইহিস সালামের দীদার পেলেন। হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কলিজার টুকরা দৌহিত্রকে শাহাদাতের সংবাদ দিলেন এবং স্বীয় হাত মুবারক ইমামের সিনা মুবারকে রেখে দোয়া করলেন, اللهم اعط الحسين صبرا واجرا "হে আল্লাহ" হুসাইনকে ধৈর্য ধারনের ক্ষমতা দান করো আর তাকে উত্তম বদলা দাও।

কী যে দুঃসময়! সুলতানে দারাঈন আক্কা আলাইহিস সালামের নুরে নযরকে অজস্র প্রত্যাশাসহ অতিথি করে আনা হয়েছে। আবেদন ও দরখাস্তের স্তুপ পাঠানো হয়েছে। প্রতিনিধি ও বার্তা প্রেরণ যেনো নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কুফাবাসী রাতব্যাপী তাদের ঘরে আহলে বাইতের আগমনের স্বপ্ন দেখেছিল এবং আনন্দ চিত্তে ফুলের পাপড়ীতে বরণ করে নিতে দেখিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিজাযের পথে বসে ইমামের আগমনের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনেছে। অতঃপর ইমামকে না পেয়ে বিষণ্ন মনে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু! ঠিক যখনি ইমামে পাক করুণাবশত তাদের যমীনে পা রাখলেন, তখন সে কুফী সৈন্যদল সম্মুখভাগ ঘেরাও করে তাদেরকে নিয়ে আসছে। কোথায় সে স্বপ্নে দেখা অভিবাদন? কোথায় সে আপ্যায়ন? না দিলো তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে না দিলো ফিরে যেতে। মহামান্য এ অতিথিবর্গ শেষতক খোলা ময়দানে অবস্থান করলেন। লজ্জা-শরম'র দুশমনদের ন্যূনতম লজ্জাবোধ হলোনা। পৃথিবীর কোথাও এমন স্বর্গীয় অতিথির সাথে এতো জগন্য ন্যাক্কারজনক আচরণ করা হয়নি, যা ঐ কারবালাতেই কুফীগণ ইমামে পাকের সাথে করেছে।

একদিকে ভিনদেশী মুসাফিরদের মাল-পত্র বিক্ষিপ্ত হালতে পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে ইবনে যিয়াদের স্বসস্ত্র বাহিনী তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাওয়াত করে আনা মেহমানদের সামনে সে সৈন্যদল নিজেদের তলোয়ারের ধার প্রদর্শন করছে। দেখুন কোথায় শিষ্টাচার দেখাবে,তা না করে রক্তপাত করবার জন্য তলোয়ার হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে! ফোরাত নদীর দু'ধারে সৈন্য-সামন্তের অবস্থান ছিলো অবধারিতভাবে। দু'প্রান্তে অবস্থান নেয়া ইয়াযিদ বাহিনীই কেবল ফোরাতের পানি স্পর্শ করতে পারবে। ইমাম আলী মকামের লশকরতো ঐ ফোরাতের এক ফোটা পানির ধারে কাছেও যেতে পারবেন না। একে একে ইয়াযিদ বাহিনীর যারাই ঐ তাবুর ধারে এসেছে সকলেরই যেনো আহলে বায়তে রিসালাতের রক্তের প্রতি তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত দৃশ্যপট এমনই হতে চললো যে, এখন আর ফোরাতের পানিতে তাদের তৃষ্ণা মিঠছেনা। আহলে বাইতের রক্তই কেবল তাদের তৃষ্ণা দুর করতে পারবে।

ইবনে যিয়াদের চিঠি

কারবালায় পৌছে শক্তি নিয়ে বসবেন, ক্লান্তি দুর করবেন সেতো দুরের কথা! এরই মাঝে ইবনে যিয়াদের তরফ থেকে ইমামে পাকের খিদমাতে একটি লিখিত চিঠি এসে পৌছলো। সে চিঠিতে নাপাক ইযিদের বায়আত তলব করা হলো। ইমাম আলী মকামের কাছে। হযরত ইমামে পাক চিঠিখানা পড়ে ফেলে দিলেন আর বললেন, আমার কাছে এ চিঠির কোন উত্তর নেই।

ভেবে দেখুন কতো বড় যুলুম! আবেদন করা হয়েছিল নিজেই বায়আত হতে, করুণাময় হুসাইন যখন সে আবেদনে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কুফায় তাশরীফ আনলেন, তখন আপাদমস্তক ফাসিক ইয়াযিদের বায়আতের জন্য কিনা ইমামে পাককে বাধ্য করা হচ্ছে! যে নাপাকের হাতে বায়আত গ্রহণ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি জেনে শুনে মেনে নিতে পারে না। কোন মতেই পারে না তার হাতে হাত রাখতে। কারণ তার বায়আত ইমামের জন্য কোন ভাবেই বৈধ ছিলো না।

অতপর ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ইয়াযিদের বায়আত মেনে নেয়া সংক্রান্ত চিঠি ফেলে দেবার মত দুঃসাহস ঐ 'নির্লজ্জদের' বেকায়দায় ফেলে দিলো। একজন ফাসিক পাপিষ্ঠের বায়আত মেনে নেয়া বৈধ ছিলনা বলে ইমাম

আলী মকাম ঐ চিঠি পাওয়ার পর বলেছিলেন, আমার নিকট এ চিঠির কোন জওয়াব নেই। ফলে ইবনে যিয়াদের হিংস্রতা আরো বেড়ে যায়। সে সৈন্য-সামন্তের বহর আরো জোরদার করে। এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতিত্বের দায়িত্ব দেয় আমর ইবনে সা'দকে। আমর ইবনে সা'দ ছিলো রায় প্রদেশের গর্ভনর। যা খোরাসানের একটি শহর। বর্তমানে তা ইরানের রাজধানী। এ শহরকে তেহরানও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধাভ্যাসি সৈন্যদের সকলে হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, শান-শওকত সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলো এবং তার শৌর্যবীর্যের স্বীকৃতিদাতাও ছিলো। এ কারণে ইবনে সা'দ ইমামে পাকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায়নি। সে প্রথম থেকেই নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। সে চেয়েছিল ইমামে পাকের রক্ত প্রবাহিত না করতে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাকে বাধ্য করে। তাকে বলা হলো তোমার জন্য দুটি পথ রাখা হয়েছে-হয়তো রায় প্রদেশের শাসনকর্তার পদ ছাড়ো। না হয় ইমামের সঙ্গে মুকাবিলা করো। পরিশেষে পার্থিব হুকুমাতের 'মোহ' ইবনে সা'দকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছে। যে কাজটি তার কাছে অপছন্দ ছিলো এবং যে দুর্ঘটনার ভাবনায় তার হৃদয় প্রকাম্পিত হতো-শেষতক সে গর্হিত কাজটিই তাকে করতে হয়েছে।

ইবনে সা'দের রওয়ানা

সমস্ত ফৌজ নিয়ে ইবনে সা'দ ইমাম আলী মকামের সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। আর ইবনে যিয়াদ অবিরামভাবে বাহিনীর উপর বাহিনী পাঠাতে থাকে। এমনকি আমর ইবনে সা'দের কাছে বাইশ হাজার সৈন্যবাহিনীর 'বিশাল বহর' বাহন নিয়ে ও পায়ে হেটে সমবেত হয়। বিরাট এ দলটি কারবালায় পৌছে ফোরাতের কিনারায় অবস্থান করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রও স্থাপন করে।

অবাক করা ব্যাপার হলো, পৃথিবীর কোন যুদ্ধে এমন নযীর খুজে পাওয়া যাবে না - যেখানে মাত্র ৮২জন পবিত্র সত্তা, আছেন বিবিগন, আছেন বাচ্চা ও অসুস্থ। তার উপর এদের মধ্যে কেউই যুদ্ধ পন নিয়ে কুফায় আসেননি। মুকাবিলা করবার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থাও রাখেননি। তাদের জন্য কিনা বাইশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে! আখের ঐ বিরাশি শুভ্র সত্ত্বার মনের অবস্থাটা কেমন হতে পারে? কী ভাবছেন তারা? হিম্মাত ও সাহসের কোন ধরনের দৃশ্য তাদের নয়নগুলো প্রত্যক্ষ করছে? ছোট্ট একটি দলের জন্য দ্বিগুন, চারগুন, দশগুন, কিংবা একশগুন সৈন্যকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি বরং অগনিত লশকর প্রস্তুত করা হয়েছে। এ যেনো নিরস্ত্র নবী বংশের সামনে "ফৌজর" পাহাড় খাঁড়া করে রাখা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইয়াযিদ বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো। যুদ্ধ পরীক্ষা দিতে আসা বাহিনীর মাঝে সাহসিকতায় যথেষ্ট ঘাটতি ছিলো। তারা ভাবতে লাগলো, হকপন্থী বাঘগুলোকে হামলা করে দুর্বল করা খুবই কঠিন হবে। অতএব বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, প্রথমেই ইমাম বাহিনীর জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। যাতে পানির পিপাসা ও গরমের তীব্রতায় বাঘ গুলোর শক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। তারা যেন দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। আর তখনই যুদ্ধ শুরু করা শ্রেয় হবে।

وہ ریگ گرم اور وہ دھوپ اور وہ پیاس کی شدت + کریں صبر و تحمل میر کوثر ایسے ہوتے ہیں

সে তপ্তময় বালু-রৌদ্রের খরতাপ-তৃষ্ণায় হাহাকার!
কাউসারের মালিক এমনই হয়, করে সহ্য ধরে ধৈর্য নিরবে একাকার।

আহলে বায়তের জন্য পানি বন্ধ করা, তাদের রক্তের নদী প্রবাহিত করার নিমিত্তে অগ্রসর হওয়া, এতগুলো সৈন্য সামন্তের অবস্থান তৈরি করা নিঃসন্দেহে ইয়াযিদ বাহিনীর নির্লজ্জতার পরিচয়। যারা ইমাম আলী মকামকে হাজারো আবেদন প্রেরণ করে দাওয়াত দিয়েছিলো। হযরত মুসলিম বিন আক্বীলের দস্তে পাকে ইমামের বায়আত নিয়েছিলো, তারা আজ কোথায়? না আছে সে দুশমনদের কোন পরওয়া- না আছে ওয়াদা ও বায়আতের স্মরণ- না আছে দাওয়াত ও মেযবানের সৌজন্যতা। সবকিছুই যেন মিথ্যে অঙ্গিকার ও সাজানো নাটক ছিল।

ফোরাতের অফুরন্ত পানি খান্দানে রিসালাতের জন্য কালো হৃদয়ের লোকগুলো আজ বন্ধ করে দিয়েছে। আহলে বায়আতের ছোট ছোট নুন্নে মুন্নে বাগে ফাতিমার ফুলগুলোর ঠোঁট জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। এক ফোটা পানির জন্য অবুঝ বাচ্চাগুলো আর্তনাদ করে চলেছে। তৃষ্ণার তীব্রতায় যেনো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। অসুস্থ সদস্যদের জন্য সে দরিয়ার কিনারা দুর্গম জঙ্গলে রূপ নিয়েছে। পানি আজ আলে রাসুলের জন্য দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আজ তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করতে হবে।

এভাবেই দানা-পানি ছাড়া কেটে গেলো তিন দিন। মাসুম বাচ্চা আর সতীসাধ্বী বিবিগণ ক্ষুধায় কাতর! পাশবিক এমন যুলুম নির্যাতনের সামনে যদি শক্তিশালী রুস্তমও হতো, তবে সে সহ্য করতে না পেরে খুব তাড়াতাড়ি মাথা নত করে দিত। তার শক্তি-সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে পড়তো। (রুস্তম হলো পারস্যের বিখ্যাত বাহাদুর সৈনিক)। কিন্তু যুলুমের উপর যুলুম আর উপর্যপুরি কষ্ট দেবার পরও আলে রাসুল ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তার স্বজনদের কোনভাবেই স্থির কদম থেকে সরাতে পারলনা। তাদের দৃঢ় মনোবলে কোন পরিবর্তন আসল না। সত্যের ধারক বাহক হক্কের লালনকর্তা বিপদের ভয়াবহতায় ঘাবড়ে যাননি। তুফানের সায়লাবে তার স্থির কদমে হঠাৎ পিচ্ছিলতায় কাপুরুষতাও প্রকাশ পায়নি। দ্বীনের জন্য কুরবান হতে গিয়ে দুনিয়ার আপদের কল্পনায় অস্থিরও হননি।

দশ মুহররাম পর্যন্ত শত্রু পক্ষ হতে একের পর এক প্রস্তাব এসেছে। আর বলা হয়েছে, ইয়াযিদের বায়আত গ্রহণ করা হোক। যদি "ইমামে পাক" নাপাক ইয়াযিদের বায়আত মেনে নিতেন, তাহলে সমস্ত লশকর সেদিন ইমামের জন্য অভিবাদন জ্ঞানপকারী হয়ে যেতো। পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিত। ধনভান্ডারের মুখ উন্মুক্ত করে দেয়া হত আর দুনিয়ার ঐশ্বর্য তার কদমে পাকে নজরানা করা হত। কিন্তু যে সত্তার হৃদয় পাথির্ব মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অস্থায়ী জগতের রহস্য যার কাছে উম্মোচিত- তিনি কি কখনো এ ধোঁকাবাজির ফিতনায় নিপতিত হতে পারেন? যে চোখ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের জলওয়া দেখেছেন, সে চোখ কি লোকদেখানো রূপ রঙ্গে দৃষ্টি দেবেন?

ইমাম আলী মকাম পার্থিব আরাম-আয়েশের মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন। সত্য পথ অন্বেষনের অন্তরায় হতে যাওয়া বিপদগুলোকে খুশি মনে সাধুবাদ জানালেন। এমন নির্দয়তা ও আপদ সত্ত্বেও নাজায়েয বায়াআতের ধারনাকে স্বীয় কলব মুবারকে স্থান দিলেন না। মুসলমানের অনিবার্য ধ্বংস ও নিঃস্ব হওয়ার প্রতি ভ্রক্ষেপ করলেন না। নিজের পরিজনের ক্ষতিসাধন ও রক্ত বাহানোকে সাদরে মনযুর করে নিলেন। তবুও ইসলামের মর্যাদায় ঘুনে ধরাকে সহ্য করলেন না।

৬১ হিজরী ১০ মুহাররম'র হৃদয় বিদারক ঘটনা

মীমাংসার সর্বপ্রকার রাস্তা যখন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং কোনভাবেই অত্যাচারী গোষ্ঠি সমাধানের দিকে ধাবিত হলনা এমনকি ইমামে পাকের তরফ থেকে সবধরনের পন্থার খসড়া পেশ করার পরও আহলে বাইতের রক্ত পিপাসুরা কোন কথায় রাজী হল না। তখন ইমাম আলী মকামও বুঝে নিলেন এখন আর মুক্তির কোন অবকাশ নেই। তারা না এ শহরে প্রবেশ করতে দিবে? না এখান থেকে ফিরে যেতে দিবে, না এ রাজ্য ছেড়ে দেয়ার উপর তারা প্রশান্ত হবে। তারাতো প্রাণই চায়। অতএব এ যুদ্ধ রুখে দেবার কোন পথই অবশিষ্ট থাকল না। পরিশেষে সুলতানে কারবালা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু স্বীয় অবস্থান স্থলের পাশ ঘিরে একটি খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। খন্দক খনন করা হলো। খন্দকের একদিকে একটি মাত্র রাস্তা রাখা হয়। যাতে ঐ রাস্তা দিয়ে বের হয়ে দুশমনদের সাথে মুকাবিলা করা যায়। দুশমনদের আগ্রাসন থেকে তাবুবাসীর নিরাপত্তার জন্য গর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

দশ মুহররাম! যেনো কিয়ামত সাদৃশ্য! জুমুআর দিন ভোর বেলা। স্বীয় সফর সঙ্গী ও আহলে বায়াতকে সাথে নিয়ে জীবনের শেষ নামায জামাআত সহকারে আদায় করলেন। কী ছিলনা সেই নামাযে? আগ্রহ-আস্বাদন, অনুনয়-বিনয়-সবই ছিলো। সাজদার কপালগুলো সেদিন খুবই মজা নিলো। কিরাত-তাসবীহ পাঠ করে তৃপ্তি লুফে নিলো নূরানী কণ্ঠগুলো আর প্রতিটি যুবান। ইমামে পাক নামায থেকে পৃথক হয়ে শিবিরে তাশরীফ আনলেন। দশ মুহররমের সূর্য উদয় হলো। তিন দিন ধরে ক্ষুর্ধাত ও পিপাসার্ত আহলে বায়ত এবং তাদের সফর সঙ্গীরা। না মিলেছে এ ফোটা পানি! না খেয়েছে এক গ্রাস খাবার! বস্তুত পক্ষে তারাই সে দূর্বলতা ও অক্ষমতা অনুভব করতে পারবে, যারা দু'তিন দিন না খেয়ে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। তারাই বুঝতে পারবে ক্ষুধা আর তৃষ্ণার যন্ত্রণা কেমন হতে পারে! তার উপর ভিন দেশের রৌদ্র খরতাপ আর গরম হাওয়া রিসালাতের কোলে লালিত হওয়া সত্তাগুলোকে উদাস করে দিয়েছে। নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে দেবার লক্ষ্যে বাইশ হাযারের ফৌজ আর তরুতাজা সৈন্য দিয়ে বর্শা ও তলোয়ারের সারিতে মওজুদ যুদ্ধের দামামা বাজানো হয়েছে। কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফরযন্দ, ফাতিমা যাহরার কলিজার টুকরাকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দানকারী গোষ্ঠী যেনো জান নিয়ে খেলার লক্ষ্যেই দাওয়াত দিয়েছে।

তাক্বরীর/ভষণ

হযরত ইমাম আলী মকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ উপক্রম ক্ষণে একটি ভাষন প্রদান করেন। সে ভাষণে তিনি বললেন, অন্যায় ভাবে রক্ত প্রবাহ করা আল্লাহ পাকের গজবকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। হে ইয়াযিদ বাহিনী! তোমরা এ পাপের কাজে নিজেদের নিক্ষেপ করো না। আমিতো কাউকে হত্যা করিনি। কারো ঘরে আগুন দেইনি- কারো উপর হামরা করিনি। যদি তোমরা এ শহরে আমার আগমন না চাও, তবে আমায় ফিরে যেতে দাও। আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা। আমিতো তোমাদেরকে কোন কষ্ট দেইনি- তাহলে তোমরা আমার প্রাণ নিতে চাও কেনো? কেনইবা আমার রক্ত নেবার অপবাদের নিকৃষ্ট হতে চাও? রোয হাশরে আমার খোনের কীইবা জবাব দিবে? স্বীয় পরিনাম নিয়ে ভাব আর শেষ পরিণতির দিকে দৃষ্টি দাও। তিনি আরো বললেন, হে ইবনে যিয়াদ বাহিনী। তোমরা এও ভাবো যে, আমি কোন বারেগাহে রিসালাতের করুণা প্রাপ্ত? কে আমার পিতা? আমার মা কার লখতে জিগার? আমি ঐ বাতুলে যাহরার নূরী পুতলা- যিনি পুলসিরাত হবার প্রাক্কালে আরশ থেকে আহবান করা হবে হে হাশরবাসী! মাথা নত করো আর চোখ বন্ধ রাখো এজন্য যে, খাতুনে জান্নাত ফাতিমাহ সত্তর হাযার হুর নিয়ে সৌভাগ্য কাফেলাসহ এ মুহূর্তে পুলসিরাত অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। আমি সেই সত্তা, যার প্রতি ভালোবাসাকে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের প্রতি ভালোবাসা বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার মর্যাদা সম্পর্কে তোমার খুবই অবহিত, যে সকল হাদীস আমার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে তা সম্পর্কে তোমরা নাওয়াক্বিফ নও।

ইমামে পাকের মর্মস্পর্শী এভাষনের জওয়াবে তারা বললো। আপনার মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সবই জানা আছে কিন্তু এখন এসব ছাড়ুন। এ মুহূর্তে তা আলোচনার বিষয় নয় রবং কাউকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করুন আর ভাষণ খতম করুন। ইমাম আলী মকাম বললেন, আমি কোন প্রমানাদি রাখতে চাইনা, যাতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পিছনে কৌশল/কারণসমূহ হতে আমার পক্ষ থেকে কোন কৌশল অবশিষ্ট থেকে না যায়। অতএব তোমরা যখন বাধ্যই করছ তাহলে নিরুপায় হয়ে এবার আমাকে তলোয়ার হাতে নিতেই হবে।

ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত

তুমুল বাক-বিতন্ডা চলছে, ঠিক এমন সময় শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। যার নাম ছিল মালিক বিন ওরওয়া। সে দেখতে পেলো হোসাঈনী শিবিরের নিকটবর্তী খন্দকে আগুন জ্বলছে এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি হচ্ছে আর তাবুবাসী এ কৌশল দ্বারা নিরাপত্তা অনুভব করছে। তখন এ বদ বাতেন বেআদব লোকটি ইমাম আলী মকামকে উদ্দেশ্য করে বললো। হে হুসাঈন! তুমিই সর্বপ্রথম ঐ আগুনে দগ্ধ হয়ে যাও! হযরত ইমাম আলী মকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন। كذبت يا عدوالله হে খোদার শত্রু! তুমি মিথ্যুক। তোমার কি ধারণা আমি দোযখে যাবো?

গুস্তাখ মালিক বিন ওরয়াহর এ জগন্য বেয়াদবী হযরত মুসলিম বিন আউসাজাহকে ভীষণ ব্যথিত করলো। তিনি ইমামে পাকের কাছে ঐ দুশমনের মুখে তীর নিক্ষেপের অনুমতি চাইলেন! কিন্তু ধৈর্য-সহ্যের বিরল দৃষ্টান্ত দেখুন, তাকওয়া-পরহেযগারীর উপমা দেখুন! ন্যায় ইনসাফের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখুন। এমন হালতে পর্যন্ত! যখন যুদ্ধের জন্য মজবুর করা হচ্ছে, রক্তের পিপাসায় তলোয়ার ধারানো হচ্ছে, প্রাণ কেড়ে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, গোস্তাখের মুখে এমন অশালীন বাক্য বের হয়েছে। তা সত্বেও দেখা গেল আরেক জন প্রাণ বিসর্জনকারী যখন ঐ বেয়াদবের মুখে তীর নিক্ষেপের অনুমতি চায়লেন, তখনও ইমামের জযবাহ নিজের আয়ত্বে রয়েছে। ক্রোধকে জেগে উঠার সুযোগ দেননি তিনি। ইমাম আলী মকাম বললেন, খবরদার! আমার তরফ থেকে যেনো যুদ্ধের সূচনা না হয়। এই রক্ত ক্ষরনের দায়ভার যেনো ঐ দুশমনদের ঘাড়েই বর্তায়। আমার দামান যেনো হত্যার রক্তে নাপাক না হয়ে যায়। হে মুসলিম! তোমার হৃদয়ে যে ব্যাথার অনুভব হচ্ছে তা আমার হৃদয়েও হচ্ছে। তোমার দহন হওয়া হৃদয়ের আরোগ্যের ব্যবস্থাও আমি করবো। এখন দেখো আমি কী করছি। এ বলে ইমাম পাক ফরিয়াদের উদ্দেশ্যে হাত উত্তোলন করলেন আর মা'বুদের দরবারে আরয-করলেন। হে মালিক! জাহান্নামের আগুনে পুড়াবার পূর্বে এ বেয়াদবকে তুমি দুনিয়ার আগুনে পোড়াও! হাত উঠানো মাত্রই মালিক বিন ওরওয়াহর ঘোড়াটির পা পিছলে গেলো। ঐ বেআদব মুহূর্তেই ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যায়। তার পা ঘোড়ার লাগামের সাথে আটকে যায়। ঘোড়াটি তাকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে জ্বলন্ত আগুনের পরিখায় ঐ গোস্তাখকে নিক্ষেপ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। কত দ্রুত ইমাম পাকের দোয়া ক্ববুল হয়েছে। আর ঐ গোস্তাখ তার পরিনতি দুনিয়াতেই দেখে গিয়েছে। ইমামে পাক শুকরানা সাজদাহ আদায় করলেনং। পরওয়ার দিগারে আলমের হামদ-প্রশংসা আদায় করলেন।...... হে আল্লাহ! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তুমি আহলে বাইতের দুশমনকে দ্রুত শাস্তি দিয়েছ।

ইমামে পাকের যুবানে এমন বাক্য শুনে দুশমন কাতার হতে অন্য এক দুরাচার বলে উঠলো, পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে তোমার কীসের নিসবত? নবীর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? এ বাক্যটি ইমামে পাকের জন্য ছিলো খুবই বেদনার! সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত উঠালেন আর ঐ গুস্তাখের জন্য বদ দোয়া করলেন। আরয করলেন, হে খোদা! এ দুর্ব্যবহারকারীকে তুমি দ্রুত পাকড়াও করো। দেখুন সমূহ পৃথিবীতে শত্রুর এ বাক্যের চেয়ে অধিক মিথ্যা আর কী হাতে পারে? নবীজির দৌহিত্র-নবীজীরই কলিজার টুকরাকে বলা হয়েছে- হে হুসাইন! তোমার সাথে নবীর কীসের সম্পর্ক? ইমামে পাক হাত না নামাতেই ঐ মিথ্যুক দুরাচারের হাজত শুরু হয়ে গেল। সে প্রকৃতির অসহ্য ডাক সামলাতে না পেরে বসে পড়লো। একটি কালো বিচ্ছু তাকে দংশন করা আরম্ভ করলো। নিরুপায় হয়ে নিরলজ্জ ঐ জাহান্নামী পায়খানা করে। নাপাক মল-মূত্রে গাড়গড়ি করতে করতে এক সময় জাহান্নামের দরজায় পৌছে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

এমন দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার পরও ঐ পাষান অন্তরগুলোর কোন অনুশোচনা হলনা। অতঃপর এক যেনাকারী ইমামে পাকের সামনে এসে ইমাম আলী মকামকে সম্ভোধন করে বললো। হে হুসাঈন! ঐ দেখো ফোরাতে আজ জোয়ার বয়ছে। ঢেউ তার 'হৃদয়কে' মাতাল করছে। কিন্তু খোদার কসম! এ ফোটা পানিও তোমাকে ছুঁতে দেয়া হবেনা। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমাম আলী মকাম আবারো হাত উঠালেন আর ফরিয়াদ করলেন اللهم امته عطشانا হে আল্লাহ! তুমি এই বেয়াদবকে তৃষ্ণায় কাতর করে মৃত্যু দাও। ইমামের এ প্রার্থনা শেষ না হতেই ঐ দুশমনের ঘোড়াটি উত্তেজিত হয়ে দৌড়ানোর এক পর্যায়ে তাকে নীচে নিক্ষেপ করে দিয়ে ঘোড়াটির পালাতে থাকে। ঐ অভিশপ্ত ঘোড়ার পিছন ছুটতে গিয়ে কঠিন তৃষ্ণায় পতিত হয়। অতঃপর العطش العطش আল আত্বশ- আল আত্বশ বা পিপাসা-পিপাসা বলতে থাকে। এ অবস্থায তার মুখে পানি দেয়া হলে সে পানির একটি ফোটাও পান করতে পারলনা। শেষ পর্যন্ত তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হয়।

আলেরাসুলে সায়্যিদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমাণ করলেন যে, মহান

আল্লাহর দরবারে নবী বংশের 'নৈকট্য ও মর্যাদার' কথা কুরআনের আয়াত ও প্রসিদ্ধ হাদীসে পাকে যেমন স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তদ্রুপ তাদের কারামাত ও অলৌকিক ক্ষমতাও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমান হয়েছে। মীমাংসা করবার জন্য এ অলৌকিক ঘটনাগুলো ইমামে পাকের পক্ষ হতে করুনার বহিঃপ্রকাশও বটে। হে ইয়াযিদ বাহিনী! যদি তোমাদের অর্ন্তঃচক্ষু থাকে, তবে দেখে নাও যিনি এমন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (মাকবুল সত্তা)-তার সঙ্গে মুকাবিলা করা মানে স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল। অতএব এই মুকাবিলার পরিনাম নিয়ে ভাব আর নিজেদের সংযত রাখ। কিন্তু আপাদমস্তক যারা নিকৃষ্ট তারা এ অলৌকিক ক্ষমতা থেকে কিইবা শিক্ষা নেবে? ক্ষণস্থায়ী জগতের লালসার ভূত যাদের মস্তিষ্কে সাওয়ার হয়েছে, তারাতো জন্মান্ধ। অপায়াগুলো নিজেদেরকে বেয়াদবী থেকে রক্ষা করবেতো দুরের কথা বরং উল্টো ধমক দিয়ে ময়দানের দিকে ধেয়ে আসছে। আর অহমিকার সাথে ঘোড়া দৌড়িয়ে হাতিয়ার চমকিয়ে ইমামে পাকের বিপক্ষে যুদ্ধ কামনা করছে।

একদল গ্রামবাসীর হুসাঈন প্রেমে শাহাদত বরণ

ইমাম আলী মকাম ও ইমাম পরিবারের নূরী সন্তানগণ জানবাজি করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। ময়দানে নেমে পড়ার অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামবাসী যারা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছে নবী পরিবারের করুণ দশার ঘটনা। গ্রামের মুসলমানগণ উৎকণ্ঠার সাথে ইমামে পাকের নিকট হাযির হয়। তারা ইমামে পাকের কাছে আবেদন রাখে হে ইমাম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্য হতে একজনও বেঁচে থাকবে-ততক্ষণ পর্যন্ত আহলে বাইতের একজন বাচ্চাও ময়দানে যাবেন না। তাদের বিনয়াবত আবেদন ছিলো করজোরে। শেষ পর্যন্ত ইমাম আলী মকামকে তাদের ফরিয়াদ কবুল করতে হয়েছে। অতপর তারা ময়দানে অবতীর্ন হয়ে বীরত্বের সঙ্গে দুশমনে আহলে বাইতের মুকাবিলা করেছে এবং যুদ্ধ নৈপূণ্যের নযীরও স্থাপন করেছে। ধ্বংস করে দিয়েছে অসংখ্যা শত্রুকে আর ইখতিয়ার করেছে সুশোভিত জান্নাতের সরল পথকে। এভাবেই ইমানদার গ্রামবাসীর অনেকেই আলে রাসুলের প্রেমে নিজের জীবন কুরবান দিয়ে অমর হয়ে আছে। সে সকল বীর সিপাহসালার জানবাযদের নামের তালিকা ও তাদের বিস্তারিত বর্ণন সিয়ারের গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ আছে। এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করণের নিমিত্তে বিস্তারিত আর তুলে ধরা হলনা।

নওদুলহা হযরত ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ'র শাহাদাত বরণ

অসংখ্য হুসাঈন প্রেমিক গ্রামবাসী হতে শুধুমাত্র ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ কলবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আলোচনা এখানে তুলে ধরা হলো। যিনি বনী কালব গোত্রের সুশ্রী, সৎ ও আকর্ষণীয় পুরুষ ছিলেন। উঠতি যৌবন ও যৌবনের সূচনালগ্ন আর কুসুমিত ক্ষণ অতিক্রম করছিলেন মাত্র। দুলহা সেজে সিংহাসনে বসেছেন এইতো সতেরো দিন হতে চললো। বিয়ের খুশিক্ষণ এখনো কেটে উঠেনি তার। বিধবা মায়ের একমাত্র উপার্জনক্ষম ঘরের চেরাগ এ যুবক। আনন্দঘন এমন মুহূর্তে বিধবা মা তার কাছে এলো। মমতাময়ী মা কোন কথা ছাড়া প্রিয় বেটাকে বুকে জড়িয়ে কান্না শুরু করে দেয়। মায়ের কান্নায় চিন্তিত হয়ে পড়া সন্তান মাকে জিজ্ঞেস করলো ওমা কী হয়েছে? কোনো এ আহযারী? কই জীবনে কোনদিন তোমার সাথে কোন নাফরমানিতো করলামনা। না ভবিষ্যতে করবো। বলো মা কাঁদছ কেন? তোমার আনুগত্য আমার উপর ফরয। সারা জীবন তোমার আনুগত্যই করব শুধু। বলো মা তোমার হৃদয়ে কীসে কষ্ট দিয়েছে। কার চিন্তায় তোমাকে এমন অঝোরে অশ্রুসিক্ত করছে? চিন্তা করোনা মা! তোমার আদেশ পালনে এ অধম জীবন কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আছে। বলো মা কাদঁছ কেনো! একমাত্র সন্তানের এমন নেকপূর্ণ কথা শুনে মায়ের কান্নাস্রোত যেনো আরো বেড়ে গেলো। মা এবার বলতে লাগলো হে কলিজার টুকরা! ওহে নয়নতারা! ওরে আমার হৃদয় রাজা! তুইতো আমার সরওয়ার! তুইই আমার ঘরের চেরাগ! আমার কাননের ফুল! আমি তিলে তিলে তোর জীবনের এ মৌসুম পর্যন্ত পেয়েছি। তুই আমার হৃদয়ের প্রশান্তি! তুই আমার প্রাণস্পন্দন! তোর একটি মুহূর্তের বিচ্ছেদ আমার জন্য অসহ্যকর। তোকে ছাড়া আমি কী করে থাকি?

چو در خواب باشم توئی در خیالم + چو بیدار گردم توئی در ضمیرم
যখন আমি স্বপ্ন দেখি, তুমি থাক আমার ধ্যানে
আমি চেতন থাকলে তুমি, থাক আমার মনে।

হে প্রাণপ্রিয় বেটা! আমি তোকে বুকের দুধ পান করিয়েছি। আজ মুস্তফা আক্বা আলাইহিস সালামের বুকের ধন, খাতুনে জান্নাতের কলিজার টুকরা কাবালার প্রান্তরে দুদর্শা ও যুলুমের শিকার! বেটা! তুই কি পারবি তোর তরুতজা রক্তকে তার কদমে বির্সজন দিতে! তুই কি পারবি তার জন্য শহীদ হতে? ঐ বেহাল জীবনগুলো আজ অবর্ণনীয় দুঃখে নিপতিত! ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনায় কোমল প্রাণগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে! কেমন বেওয়াফা আমরা! ঐ দিকে সৈয়্যদ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুরী পুতলাগুলো নির্যাতন-নিপীড়নে শহীদ হতে চলেছে। অথচ আমরা কিনা এখনো জীবন ধারণ করে আছি? বিয়ের আনন্দে মেতে আছি? যদি আমার মমতা-স্নেহের এতটুকু স্মরণ তোর এসে থাকে, তোর লালন পালনে আমার মেহনতের কথা মনে পড়ে থাকে, তাহলে হে আমার হৃদকাননের ফুল! যা তুই হযরত হুসাঈনের সরে পাকে সদক্বাহ হয়ে যা! যা বেটা ইমামে আলী মকামের জন্য কুরবান হয়ে যা। হযরত ওয়াহাব বললেন, হে মেহেরবান মা! কী

সৌভাগ্য আমার! এ প্রাণ শাহযাদায়ে কওনাঈনের তরে উৎসর্গ হবে আর এ অধমকে হাদিয়া স্বরূপ আক্বা কবুল করবেন, মাগো আমি মনে প্রাণে উম্মুখ হয়ে আছি। আমি পূর্ণ প্রস্তুত আছি মা! আমি উদগ্রীব! তবে একটি মুহুর্তের জন্য অনুমতি চাই। ঐ নববধুকে দুটো কথা বলার অনুমতি চাই, যে বধু আমার জীবন সঙ্গীনী হয়ে নিজের আরাম-আয়েশের স্বপ্ন-দেখেছে। যার আঁখি যুগল আমি ছাড়া কারো দিকে কখনো মাথা উচিয়ে দেখেনি। যার কামনা-বাসনার কেন্দ্রবিন্দু শুধুই আমি। যদি সে বিচ্ছেদ উন্মাদনায় দিক ভ্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে না পারে, তবে আমি তাকে অনুমতি দেবো যেনো সে তার জীবনকে নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা করে। মা বললেন, বেটা! নারী জাতি স্বল্প বিবেকবান হয়ে থাকে। তুই এক কাজ কর বউয়ের চিন্তা ছেড়ে দে। না হয় এ শুভদৃষ্ট তোর হাতছাড়া হয়ে যাবে। হযরত ওয়াহাব বললেন, মাগো! জেনে নাও তবে, ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রেমে এ হৃদয় এতই বাধাঁ পড়েছে যে, পৃথিবীর কেউই তা খুলতে পারবে না।আত্মোৎসর্গের নকশে দিল এতই স্থায়ী হয়েছে যে, পৃথিবীর কোন পানি তা ধুয়ে মুছে দুর করতে পারবেনা। এ কথা বলেই হযরত ওয়াহাব নববধুর কাছে গেলেন আর তাকে বললেন, হে বিবি! ময়দানে কারবালায় ফরযন্দে রাসূল-সহায়হীন-আশ্রয়হীন। ইয়াযিদ বাহিনী তাদের উপর নির্যাতনের সীমারেখা পার করেছে। আমার আশা আমি তাদের কদমে পাকে কুরবান হয়ে যাব। এ কথা শুনতেই নববধু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো, হে হৃদয়ের প্রশান্তস্থল! আফসোস এ ব্যাপারে যে, আমি এ যুদ্ধে আপনার সঙ্গীনী হতে পারছিনা। শরীয়তে ইসলামিয়্যাহ নারী জাতিকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়নি বলে। দুঃখ আমার! এমন সৌভাগ্যের কাজে আমার অংশগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। তা নাহলে বিশ্বস্পন্দন হুসাঈনের জন্য কবেই প্রাণ কুরবান দিয়ে দিতাম। হে স্বামী! এখনো অন্তর জুড়ে আপনার চেহারটাও দেখা হয়নি। অথচ আপনি কিনা জান্নাতি ফুল হবার নিয়্যাত করে ফেলেছেন। নিশ্চয় সে জান্নাতে সুন্দরতম হুরগুলো আপনাকে পেতে চাইবে। হে প্রাণের স্বামী! তবে ওয়াদা করুন আমার সাথে যখন আপনি আহলে বাইতের সঙ্গী হয়ে জান্নাতে বাসবাস করবেন। অফুরন্ত নি'য়াত যখন আপনার কদমে হাযির করা হবে, বেহেশতী হুরগুলো যখন আপনার সেবা করতে আসবে, তখন যেনো আপনি আমায় ভুলে না যান। এ অভাগীনিকে যেনো একটু স্মরণে রাখ।

এ নওজাওয়ান স্বীয় নেকবিবি ও বুর্যগ মাকে নিয়ে ইমামে পাকের কাছে হাযির হলেন। হযরত ইমামে পাকের কাছে নববধু আরয করলেন ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহ! শহীদগণ নাকি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়তেই বেহেশতী হুরের কোলে পৌছে যায়, বেহেশতে রূপের সত্তাগুলো তখন পূর্ণ আনুগত্যে তাদের সেবা করে যায়, আমার এ নওজাওয়ান স্বামী ইমাম আলী মকামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে ইরাদা করেছে। হে ইমাম! এ অবস্থায় আমি নেহায়ত একা! না আছে আমার মা! না

আছে আমার বাবা! না আছে কোন ভাই ও নিকটাত্মীয়- যে কিনা আমার খোঁজ খবর রাখবে। ফরিয়াদ শুধু এতটুকু, ঐ প্রলয়ংকরী হাশরে আমার এই স্বামীকে যেনো আমার কাছ থেকে পৃথক করা না হয়। তাকে যেনো এ অভাগীনী থেকে আলাদা করা না হয়। হে ইমাম! এ গরীবকে দয়া করুন। দয়াবশতঃ আপনার দাসীদের কাতারে শামিল করুন আর বাকী জীবনটাতে আপনার পাক বিবিদের সেবা করার সুযোগ করে দিন।

ইমাম আলী মকামের সামনে সমস্ত ওয়াদার আদান-প্রদান সম্পাদন হলো। হযরত ওয়াহাব আরয করলেন হে ইমাম! যদি হুযুর আক্বা আলাইহিস সালাতু সালামের শাফাআতে আমার জান্নাত নসীব হয়, তবে আমি আরয করবো আমার এ বিবিকে যেনো আমার সাথে দেয়া হয়। কারণ আমি তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। তাকে আমি কথা দিয়েছি।

হযরত ওয়াহাব অনুমতি নিয়ে ময়দানের দিকে ছুটলেন। শত্রুরা দেখতে পেলো যে, ঘোড়ার উপর বসে এক অভিজ্ঞ সাওয়ার সামনের দিকে ধেয়ে আসছেন। মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে আগমনকারীর মত অনিবার্য ধ্বংস নিয়ে আসছেন। হাতে শানিত তরবারী আর কাঁধে রয়েছে ঢাল। হৃদয় কম্পনকারী আওয়াযে এ যুদ্ধ কবিতা পাঠ করছিলেন।

امیر حسین ونعم الامیر + له لمعة كالسراج المنير
ایں چہ ذوقسمت کہ جاں می بازد + وہب کلبی بسگ کوئے حسین
دست او تیغ زند تا کہ کند + روئے اشرار گیسوئے حسین

আমীর সেতো হুসাঈন-কতইনা উৎকৃষ্ট আমীর!
দীপ্তি সেতো তার, যেনো সিরাজে মুনির।
প্রসন্ন ললাট তার যে করে ফিদা জান কুরবান
ওহাব কালবি গুলামে হুসাঈন, সেই পথেই অম্লান।
হাতে তার শোভিত তবে শানিত তরবারি
জুলফে হুসাঈনের ইশকেতে হল তার মহামারি।

ক্ষিপ্র গতিতে তিনি ময়দানে পৌছলেন। গোড়ার উপর থেকে সিপাহগীরি প্রদর্শন করলেন। দুশমনের কাতার থেকে লড়াকু তলব করলেন আর যেইমাত্র শত্রুসৈন্য তার সামনে এসেছে, অমনিতেই তার মাথা উড়িয়ে দিলেন। আশ পাশের সীমানায় খন্ডিত মস্তকের স্তুপ তৈরি করলেন। ছোট-বড় দেহের রক্তে মাটি স্যাঁতস্যাঁতে দেখাচ্ছিলো। অতঃপর কিছুক্ষনের জন্য ঘোড়ার লাগাম ফিরিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে আসলেন। মাকে বললেন, হে মমতাময়ী! জানি তুমি আমার উপর এখন সন্তুষ্ট হয়েছো। অতঃপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে তাকে ধৈর্যধারণ

করার পরামর্শ দিলেন। ঐ সময় তার যুবানের হালত যেনো এই বলছিলো.......

جاں زخم فرسودہ دارم چوں نہ نالم آہ آہ + دل بدرد آلودہ دارم چوں نہ گریم زار زار

নাহি ব্যাথার আহ! আহ! দুখেই চুর্ণ করেছি প্রাণ
দরদে পতিত হৃদয় মোর, নাহি সেই প্রেম আহ্বান।

ঠিক এমন সময় শত্রু-পক্ষ থেকে মুকাবিলার জন্য যোদ্ধা তলব করা হলো। এ আহ্বান শুনামাত্র হযরত ওয়াহাব ঘোড়ায় আরোহন করলেন। আবারো ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। নববধু অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে যেনো নদী বইয়ে দিলেন।

از پیش من آں یار چو تعجیل کناں رفت + دل نعرہ بر آورد کہ جاں رفت رواں رفت

আমারে দেখিয়ে বন্ধু যাইগো ক্ষিপ্র গতি হাঁকি।
শ্লোগান মুখর চিত্ত মোর কয়, জান চলে যায় দিয়ে মোরে ফাঁকি।

হযরত ওয়াহাব শিকারী বাঘের ন্যায় শানিত তরবারী ও প্রাণ বিনাশী বর্শা হাতে বিদ্যুৎবেগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌছে গেলেন। ঐ দিকে শত্রুবাহিনী হতে প্রসিদ্ধ এক বাহাদুর হাকাম বিন তুফাইল যে কিনা লড়াই করবার অহংকারে মেতে উঠেছিলো। হযরত ওয়াহাব মাত্র একটি হামলায় তাকে বর্শার আগায়ে উঠিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্রই তার হাড্ডি-গুড্ডি চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। শত্রু বাহাদুরের এমন নাযুক হালত দেখে উভয় কাফেলায় শোরগোলের সৃষ্টি হলো। ইয়াযিদ বাহিনী মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেললো। হযরত ওয়াহাব ঘোড়া চালিয়ে এবার দুশমন কাফেলার মাঝখানে ঢুকে পড়লেন। যেই সামনে আসছে তাকে বর্শার আগায় তোলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। এমনকি বর্শাটি টুকরা টুকরা হয়ে গেলো। এবার তলোয়ার হাতে নিয়ে সজোরে আঘাত করে দুশমনের গর্দান মাথা থেকে আলাদা করে তা মাটিতে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। ভয়াবহ এ কান্ড দেখে শত্রুপক্ষ যেনো সংকুচিত হয়ে আসলো। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আমর ইবনে সা'দ আদেশ দিলো যে, তাকে যেনো চতুর্দিকে বেষ্টন করে হামলা করা হয় এবং প্রতিটি দিকে যেনো দফায় দফায় আঘাত করা হয়। বিরামহীন কাপুরুষীয় আক্রমনে হযরত ওয়াহাব এবার জখমের ভারে মাটিতে লুটে পড়লেন। অত:পর ঐ কালো হৃদয়ের হিংস্র জানোয়ারগুলো হুসাইন প্রেমিক বীর বাহাদুরের মাথা মুবারক শহীদ করে দেয়। খন্ডিত মাথা হুসাঈনী কাফেলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওয়াহাবের মা পুত্রের খন্ডিত মস্তকটি নিজের মুখে লাগিয়ে আদর করে নিলেন আর বললেন, হে বৎস! হে বাহাদুর! এখন তোমার মা তোমার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ঠ। অতঃপর মাথাটি তার স্ত্রীর কোলে ঢেলে দিলেন। স্ত্রী তার স্বামীর দেহহীন মাথায় হৃদয় ভরে চুমু দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে নিজেও সমুজ্জল স্বামীর উপর কুরবান হয়ে গেলেন। আর রুহ কবজকারী ফারিশতা স্বামীর সাথে তাকেও মিলিয়ে দিলেন।

سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں + سر کو دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا

খোদার পথে কামিয়াবী একেই বলে, শিরচ্ছেদ হতে তুমি একটুও ভাবলে না।

اسكنا الله فراديس الجنان واغرقكما في بحار الرحمة والرضوان (روضة الاحباب)

অনুবাদ: মহান আল্লাহ্ উভয়কে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা করুন এবং দয়া ও করুণার সমুদ্রে আবৃত করুন।

হুর বিন ইয়াযিদের শাহাদাত

হযরত ওয়াহাব বিন আবদুল্লাহর শাহাদাতের পর আরো সৌভাগ্যবান জানবাযরা প্রাণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদের খোশ কিসমত-তারা লড়াই করছিলেন। খান্দানে আহলে বায়তের জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করেছেন। তাদের মধ্যে 'হুর বিন ইয়াযিদ রুবাহী' উল্লেখ যোগ্য। সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি দেখে হুরের হৃদয় খুবই ব্যথিত হয়ে পড়ে। চরম অস্থিরতায় যেনো বিষন্ন হয়ে পড়লেন। অতঃপর আমর বিন সা'দের কাছে গিয়ে বললেন, তোমার এত বড় স্পর্ধা! তুমি ইমাম আলী মকামের সাথে যুদ্ধ করবে? কী জবাব দিবে তার নানাজান রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কাছে? আমর বিন সা'দের কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তর মিললনা। হুর বিন ইয়াযিদ ওখান থেকে ময়দানে চলে আসলেন। শরীর তার প্রকম্পিত হচ্ছিলো। চেহারা হলুদ ধারন করলো। দুদর্শার আলামত তার চেহারায় সুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিলো। অন্তর চুর্ণ-বিচুর্ণ হতে লাগালো। তার ভাই মাসআব বিন ইয়াযিদ এমন হালত দেখে জিজ্ঞেস করলেন। হে ভাইজান! আপনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা! পরীক্ষিত সৈনিক! বীর বাহাদুর! এ যুদ্ধ আপনার জন্য প্রথম নয়। অগনিত রক্তদৃশ্য আপনার চোখের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে। অসংখ্য দানবতুল্য আপনার খোন পিপাসু তরবারীর আঘাতে মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। অতএব এত ভীতি আপনার উপর প্রাধান্য পাচ্ছে কেনো? কিসের এতো ভয়? হুর বললেন হে ভাইজান! এটি অন্যসব যুদ্ধের মত নয় এ যুদ্ধ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আউলাদের সাথে! এ যুদ্ধ স্বীয় পরিনামের সাথে। এ মুহূর্তে আমি বেহেশত ও দোযখ'র মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পৃথিবীর সমূহ শক্তি আমাকে যেনো জাহান্নামের পথ ধরেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ভয়ে আমার হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছে। একথা বলতে না বলতেই ইমাম আলী মকামের আওয়ায তাঁর কানে বেজে উঠলো। হযরত বলছিলেন কেউ আছো কি! যে আলে রাসুলের জন্য আজ জান কুরবান করবে? সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার তরফ হতে সাধুবাদ নিবে?

এটি এমন এক আওয়ায ছিল, যা আমার পায়ের বেড়িকে খুলে দিয়েছে। অস্থির

হৃদয়ে প্রশান্তির পয়গাম দান করেছে। স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে, শাহযাদায়ে কাওনাঈন হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার পূর্বের স্পর্ধা ক্ষমা করবেন। তার ক্ষমা করা অবাক করার নয়। কারণ তিনিতো করুণাময়। দয়াময় হুসাঈন অনুকম্পাবশতঃ আমাকে শুভসংবাদ দিলেন, "এবার জান উৎসর্গ করার নিয়্যাতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়"। আমি ঘোড়া চালিয়ে ইমাম আলী মকামের খিদমাতে হাযির হলাম। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলাম, হে ইবনে রাসুল! ওহে ফরযন্দে বাতুল। আমি সেই হুর, যে সর্বপ্রথম আপনার মুকাবিলায় গিয়েছি এবং এজঙ্গলের মাঠে আপনাকে আটক করেছি। আমি লজ্জিত! আমি অনুতপ্ত আমার নির্লজ্জ বাহাদুরীর উপর। হে ইমাম! আমার অনুশোচনা আমাকে আপনার সামনে মাথা তুলে কথা বলার হিম্মত দেয় না। তদুপরি আপনার কৃপায়ময়ী আওয়ায শুনে আকাঙ্খাগুলো আজ সাহস যুগিয়েছে। অতএব আপনার কদমে এখন খিদমাতের উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছি। আপনার কৃপার সামনে দূরত্ব সে কোথায়? মেহরেবাণী করুণ! আমায় ক্ষমা করুন একনিষ্ট গোলামদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আহলে বাইতের তরে জান কুরবান করবার অনুমতি দিন।

ইমাম আলী মকাম হুরের মাথায় স্বীয় হাত মুবারক রাখলেন আর ইরশাদ করলেন, হে হুর মা'বুদের দরবারে একনিষ্ঠ বান্দাহর ইস্তিগফার মাকবুল। তাওবাও কবুল। কোন ওযর পেশকারী তার দরবার থেকে বঞ্চিত হয়না। وهو الذى يقبل التوبة عن عباده অর্থাৎ তিনি খোদা স্বীয় বান্দাহর তাওবাহ কবুল করেন। তোমাকে অভিনন্দন! আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম এবং শাহাদাতের সৌভাগ্য হাসিলের অনুমতি দিলাম। হুর অনুমতি পেয়ে ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। ঘোড়া চমকিয়ে দুশমনদের কাতারে ঢোকে পড়লেন। হুর'র ভাই মাসআব ইবনে ইয়াযিদ দেখতে পেলো যে, তার ভাই ভাগ্যের দৌলত পেয়ে আখরাতের নি'মাতে সিক্ত হয়েছে। দুনিয়াবি লিপ্সার অস্থিরতা থেকে স্বীয় স্বত্তাকে পাক-সাপ করেছে। এই হালত দেখে তার হৃদয়ে হুসাঈন প্রেমের তরঙ্গ শুরু হয়ে গেল। দেরি না করে ঘোড়ায় আরোহন করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। আমর বিন সা'দর সৈন্যরা মনে করলো যে, সম্ভবত ভাই হুরের মুকাবিলায় সে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন ময়দানে পৌছলেন ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, হে হুর! তুমি আমার চোখ খোলে দিয়েছো। আমায় পথ দেখিয়েছ এবং অনির্বায ধ্বংসে থেকে আমাকে রক্ষা করেছ। হে ভাই! আমি তোমার সাথেই আছি। আমি ইমামে পাকের শুভদৃষ্টি হাসিল করতে চাই! নিজেকে সৌভাগ্যবান হিসেবে দেখতে চাই।

মাসআব বিন ইয়াযিদের এ পরিবর্তন দেখে দুশমন শিবিরে আবারো শোরগোল পড়ে যায়। আমর বিন সা'দের শরীরে কম্পনের সৃষ্টি হলো। সে খুবই ঘাবড়ে গেলো। সকলের মধ্য হতে একজন পালোয়ানকে বেছে নিয়ে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। আর তাকে বলা হল, প্রথমে নম্রতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে হুরকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করবে এবং স্বীয় চালবাজি ও ধোকাবাজির চরম পর্যায়ে পৌছে যাবে। যদি এতেও সফল না হও, তবে তার মাথা কেটে আমার কাছে নিয়ে আসবে। লোকটি সামনে অগ্রসর হয়ে হুরের কাছে এসে বলতে লাগলো হে হুর! আমরা তোমার জ্ঞান ও বিবেকের উপর গর্ববোধ করি। অথচ আজ তুমি একি করলে? এ কেমন নির্বোধের পরিচয় দিলে? এমন সমৃদ্ধ দল হতে বের হয়ে ইয়াযিদের পুরস্কার ও সম্মানে থুথু নিক্ষেপ করে স্বল্প সংখ্যাক দিশেহারা মুসাফিরদের সাথে যোগ দিয়েছ? যাদের সাথে না আছে এক টুকরা শুকনো রুটি আর এক ফোটা পানি! তাদেরই সঙ্গী হলে? তোমার এ মূর্খতার উপর বড়ই আফসোস হয়।

হুর বললেন, আরে বে আক্কেল। আমি নই! স্বীয় মূর্খতার উপর তোরই আফসোস হওয়া উচিত এই ভেবে যে, এমন পবিত্র সত্তাগুলোকে ত্যাগ করে নাপাক ইয়াযিদের পক্ষ নিয়েছিস। পরহস্তাধীন দৌলতের বিনিময়ে ধ্বংসশীল জগতের অস্থায়ী আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিয়েছিস। আরে শোন! ইমাম আলী মকাম এমন এক সৌভাগ্যবান সত্তা, যাকে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের ফুল বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর আমি সে রিসালাত কাননের জন্য জান কুরবান করার কামনায় আছি। রেযায়ে মুস্তাফার চেয়ে দু'জাহানে বড় সম্পদ আর কী হতে পারে? শত্রুটি বললো, হে হুর! এ বিষয়গুলো আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু আমরা তো সৈনিক মাত্র! দৌলত-সম্পদ এখন ইয়াযিদের হাতে। হুর বললেন আরে ঐ ভীতু! তোর এমন ধারনার উপর লা'নত। এমন হাওসালার উপর অভিশম্পাত পড়ুক।

ইতিমধ্যে বদ বাতেনের নসীহতকারী ঐ শত্রু দৃঢ়তার সাথে উপলব্ধি করলো যে, কোনভাবেই তার চাপলোসি হুরকে প্রভাবিত করবে না, আহলে বাইতের ভালোবাসায় হুরের হৃদয় পর্ণ হয়ে আছে, আহলে বাইতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রেমে তার বুক ভরপুর হয়ে গেছে, অতএব কোন ধোঁকাবাযি ও ছলনা তার উপর চলবেনা। অতঃপর কথার ফাঁকে হঠাৎ একটি তীর হুরের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। হুরও দেরি করলেন না। পাল্টা আক্রমনে এমন তীর নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর বুক বিদ্ধ হয়ে অপর প্রান্তে বের হয়ে যায়। অতঃপর ঘোড়া তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। লোকটির তিনজন ভাই ছিল। সহোদরের এমন নাযুক অবস্থা দেখে সম্মিলিতভাবে সকলেই হুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হুরও তাদেরকে আসতে দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে তলোয়ারের আঘাতে প্রথমজনের মাথা উড়িয়ে দেন। দ্বিতীয়জনের কোমরে হাত পেঁচিয়ে উপর দিকে তোলে মাটিতে এমন

সজোরে নিক্ষেপ করেন যাতে তার গর্দান ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায়। তৃতীয়জন অবস্থা বেগতিক দেখে যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। হুর বিন ইয়াযিদ তার পিছু ছুটেন। এক পর্যায়ে কাছে পৌছে পিঠে বর্শা নিক্ষেপ করলে তা সামনের দিকে অতিক্রম করে। অতঃপর তিনি ইবনে সা'দের সৈন্য সামন্তের মাঝখানে ঢুকে পড়েন। ক্ষিপ্রতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তার রণকৌশল দেখে ইবনে সা'দের সৈন্যরা প্রশংসা করতে বাধ্য হলো। অবশেষে এ জানবায সত্য প্রতিষ্ঠায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ইমামে আলী মকামের উপর নিজের জান কুরবান করে দিলেন।

হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুরকে নিজ হাতে উঠিয়ে আনেন। হুরের মাথাটি নিজের কোল মুবারকে রেখে নূরানী হাতে তার চেহারার ধুলো-বালি পরিস্কার করেন। এখনও আখেরী নিঃশ্বাস বাকী ছিলো। ইবনে যাহরা ইমামে পাকের দামানের খুশবো হুরের মস্তিস্কে পৌছে গেল। দামানে পাকের সুঘ্রান নিতে নিতে হযরত হুর বিন ইয়াযিদের প্রাণ মুখরিত হলো। নয়ন খোলে দেখতে পেলেন তিনি ইবনে রাসুলের কোলেই আছেন। আর কী লাগে! পরিশেষে সৌভাগ্যের উপর গর্ববোধ করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শাহাদাতের কামনায় অস্থির আহলে বায়ত

হযরত হুরের পথেই হাটলেন তার ভাই ও গোলাম। দফায় দফায় বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেলেন। আহলে বাইতের জন্য কুরবান হয়ে গেলেন। পঞ্চাশের অধিক প্রেমিক ইতিমধ্যে আহলে বাইতের জন্য শহীদ হয়েছেন। এখন শুধুমাত্র খান্দানে আহলে বাইতই বাকী রইলেন। শত্রুদের দৃষ্টি এখন আহলে বাইতের দিকে। আহলে বাইতের সদস্যগণও ইমামে পাকের জন্য প্রাণ দিতে উদগ্রীব হয়ে আছেন। উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাপার হলো, ইমাম আলী মকামের এ ছোট কাফেলার কেউই এমন বিপদে সাহস হারা হননি। এমন কি সফর সঙ্গী ও দাসদাসীদের মধ্যে কারো কাছে নিজের জীবনকে আহলে বাইত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে হয়নি। আপনজনের কেউ এমন ছিলো না যে, নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন কিংবা দুশমনের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। বরং সততা ও জানবাযিতে ইসলামের প্রান বিসর্জনকারী "প্রেমিক বুলবুলিরা" জীবন দিতে ন্যূনতম দ্বিতীবোধ করেননি। প্রতিটি সদস্যের কামনা ছিলো-প্রত্যেকের করজোর আবেদন ছিল যেনো প্রাণ কুরবান করার প্রথম সুযোগটি তাকেই দেয়া হয়। তারা ছিলেন ইশক ও মুহাব্বাতের সুধাপানকারী শাহাদাতের শাওকে দিওয়ানা। যেনো দেহ থেকে মস্তক পৃথক হওয়া এবং খোদার পথে শাহাদাতের মকাম লাভ করার উপর বেখোদি হালত জারী হয়েছে। একজনকে শহীদ হতে দেখা মাত্রই অন্যজনের হৃদয়ে শাহাদাতের কামনায় তরঙ্গের সৃষ্টি হতো।

গৌরব ও বীরত্ব গাঁথা যুদ্ধ

আহলে বাইতের যুবকরা স্বীয় রক্ত দিয়ে কারবালার প্রান্তরে সাহস ও যৌবনের এমন বে-নযীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, কালের বিবর্তনধারার পক্ষে তা মুছে দেয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। অনুগত ও দ্বীনদারদের যুদ্ধ প্রদর্শন এমন ছিলো যে, যারা বীরত্বের ঝান্ডাবাহীকে মাটি ও রক্তের মাঝে বিলীন করে দিয়ে 'পানি বাহাদুরদের' উপর রাজত্ব কায়েম করেছেন। এখন সময় এসেছে আসাদুল্লাহ'র শেরে হকদের। আহলে বাইতের মর্দে মুজাহিদদের।

আলী মুরতাদার খান্দানের বাহাদুর ঘোড়াগুলো কারবালা ময়দানকে চক্করস্থলে পরিণত করলো। খান্দানে মুস্তফা ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার বাকী ছিলো মাত্র। শত্রুদের হৃদয়ে কম্পনের শুরু হয়ে যায়। প্রচন্ড হামলায় তাদের সিংহদিল বাহাদুরগুলো আর্তনাদ শুরু করে দেয়। কেন করবে না? আসাদুল্লাহ মানেইতো শানিত তরবারি! কিংবা জলন্ত আগ্নিস্ফুলিঙ্গের আতশবাজি! বনী হাশেমের হার না মানা লড়াই আর প্রাণ বিনাশী আক্রমনে পিপাসায় কাতর কারবালা ময়দানকে দুশমনের রক্ত দ্বারা ভিজিয়ে দিয়েছেন তারা। শুকনো প্রান্তর যেনো লালে লাল হয়ে গিয়েছে। স্যালুট জানানো হয়, এমন বাহাদুরদের বর্শার আগায় উঠিয়ে-মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যেনো হাশেমী যুবকদের জন্য মা'মুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অবিরাম নতুন নতুন যোদ্ধা আসছে আর মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজ হাশেমী তরবারী যেনো অবিরত মৃত্যুর ফয়সালার বাণী! আর তাদের তীরের অগ্রভাগ যেনো আখেরী সিদ্ধান্তের ফরমান। তরবারী চমক কেড়ে নিয়েছে শত্রুদের দৃষ্টিশক্তি। রণকৌশল ও আঘাতের এটম দেখে তাদের যোদ্ধারা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। যখন যে দিকে গিয়েছেন দূর্বার গতিতে শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছেন। কখনো ডান প্রান্ত আবার কখনো বাম প্রান্তে বাজিয়েছেন খরশান যুদ্ধের দামামা। ডান প্রান্তে গিয়েছেন– তো তারা দারহাম বারহাম হয়ে গেছে। দৃশ্য দেখে এমন মনে হয়েছে যেনো নিহত দুশমনদের সমূদ্র বয়ে গেছে। আবার বাম প্রান্তে চালিয়েছেন– তো দেখা গেলো একদল পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, ধমক দেয়া মাত্রই যারা মাটিতে লুটে পড়ছে। বজ্রের মতো চমকে উঠা তরবারীগুলো রক্তের মাঝে ডুব দিয়ে বার বার বের হচ্ছে। খোনের ফোটাগুলো তরবারী থেকে টপকে পড়ছিলো। এভাবেই ইমামে পাকের খান্দানের যুবকগণ স্বীয় নৈপূন্য দেখিয়ে ইমামে আলী মকামের তরে প্রাণ কুরবান করে যাচ্ছিলেন। ঐ তাবুতে যেন "بل احياء عند ربهم" অর্থাৎ 'বরং তারা তাদের প্রভূর নিকটে জীবিত'-এ ঘোষণার জীবন্ত প্রমাণ হিসাবে হৃদয়কাড়া বাগানের 'খোলা ময়দান' চোখের সামনেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কারবালার ময়দান থেকে আহলে বাইত মুলত এ মনযিলেই পৌছার চেষ্টা করছিলেন।

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাহিবযাদাগণ যুদ্ধে এমন নৈপূন্য প্রদর্শন

করলেন। শত্রুদের হুশ-জ্ঞান ক্ষীণ হয়ে পড়ছিলো। ইবনে সা'দ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, যদি আমরা অপ-কৌশল অবলম্বন না করতাম, ইমাম পরিবারের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ না করতাম তাহলে আহলে বাইতের এক একজন নওজাওয়ান আমাদের সমস্ত সৈন্যকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিতেন। যে মাত্র তারা আমাদের মুকাবিলায় আসতেন, মনে হতো যেনো খোদার গযব নাযিল হচ্ছে। দুশমনের দলবদ্ধ কাতারকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়ার এক একটি নৈপুন্য রণক্ষেত্রে অনন্যতার পরিচয় বহন করে। মোদ্দাকথা হলো আহলে বাইতের বীর যুবকগণ ময়দানে কারবালায় ইমামে পাকের জন্য নিজেদের প্রাণকে কুরবান করে দিলেন এবং বিরামহীন তীরের বর্ষন সত্ত্বেও সত্যের সংরক্ষণ থেকে বিমুখ হলেন না। গর্দান কাটিয়েছেন-রক্ত বইয়েছেন-জান কুরবান করেছেন কিন্তু কালিমায়ে নাহক যুবানে আসতে দেননি। একের পর এক সমস্ত শাহযাদা শহীদ হতে চলেছেন। তবুও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি।

হযরত ইমাম আলী আকবার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর) শাহাদাত

এখন হযরত ইমাম আলী মকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সামনে কেবল তার নুরে নযর হযরত আলী আকবারই অবশিষ্ট আছেন। পিতার কাছে ময়দানের যাবার অনুমতি চায়ছেন। খোশামদ আর বিনয়ের সাথে আবেদন করে যাচ্ছেন। কতোইনা কঠিন সময়! আদরের সন্তান কিনা করুণাময় পিতার কাছে গর্দান শহীদ করতে অনুমতি চায়ছেন! রীতিমত করজোরে মিনতিও করছেন। সন্তানের এমন কোন আবদার ছিলনা, যা পূর্ণ করা হয়নি। আজকের কঠিন পরিস্থিতিও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে না বলতে দেয়নি। হ্যাঁ বলতে বাধ্য করেছে। প্রিয় ফরযন্দের এ আকুল আবেদন না জানি ইমামে পাকের হৃদয়ে কতোটা প্রভাব ফেলেছে। অনুমতি দিবেন বটে, কিন্তু কিসের? আর যদি গর্দান শহীদ করতে-রক্ত ভাসাতে অনুমতি না দেন, তবে রিসালাত কাননের সুশোভিত ও ফুলটিযে আজ শুকিয়ে যাবে। শাহাদাতকামী আলী আকবারের করজোর এতই বেশী ছিলো-শাওকে শাহাদাত তাকে এমন বেসামাল করে দিলো যে, শেষতক বাধ্য হয়ে ইমাম আলী মকামকে অনুমতি দিতেই হয়েছে। ইমামে পাক সুদর্শন প্রিয় আওলাদকে নিজেই ঘোড়ার উপর তোলে দিলেন। যুদ্ধ সরঞ্জাম পবিত্র হাতে লাগিয়ে দিলেন। মজবুত প্রতিরোধক মাথায় রাখলেন। কোমরে পাট্টা বাঁধলেন। তলোয়ার হাতে নিলেন এবং মুবারক হাতে তীর উঠিয়ে দিলেন। না জানি সে সময় আহলে বাইতের বিবি বাচ্চাদের উপর কী অবস্থা বিরাজ করেছে? যাদের সমস্ত সঙ্গী-গোত্রীয় ভাই ও আউলাদগণ একে একে শাহাদাতের সুধা পান করে বিদায় নিয়েছেন আর এখন অবশিষ্ট দীপ্ত চেরাগটিও আখেরী সালাম জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ সমূহ মুসীবত কেবল মাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ঠি লাভের উদ্দেশ্যেই। আহলে বাইতের সহ্য-ধৈর্য শুধু তারই নিমিত্তে। সত্য বলতে এই কুরবানী তাদেরকেই মানায়।

হযরত আলী আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবার বিদায় নিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাশরীফ নিলেন। তিনি যখন ময়দানে কারবালায় উপনীত হচ্ছিলেন, মনে হলো যেনো ময়দানের উষাস্থল দিয়ে একটি ঝকঝকে সুর্য্যের উদয় হয়েছে। মিশক'র সু-গন্ধে সমূহ ময়দান সুবাসিত হতে চলেছে। দীপ্তিময় চেহারার আভাতে সমগ্র ময়দানকে নুরানী জগতে রূপান্তর করে দিয়েছে।

نور نگاہ فاطمہ آسماں جانب + صبر دل خدیجہ پاک ارم قباب
صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب + گیسو تھے مشکناب تو چہرہ تھا آفتاب
کاکل کی شام رخ کی سحر موسم شباب + سنبل نثار شام فدائے سحر گلاب
پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں + شرمندہ اس کی نازکی سے شیشۂ حباب
خورشید جلوہ گر ہوا پشت سمند پر + یا ہاشمی جوان کے رخ سے اٹھا نقاب
چہرہ کو اس کے دیکھ کے آنکھیں جھپک گئیں + دل کانپ اٹھے اور ہو گیا اعدا کو اضطراب
نیزہ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں + یا اژدہا تھا موت کا یا اسوء العقاب
کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں + ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب
کوہ پیکروں کو تیغ سے دو پارہ کر دیا + کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تا رکاب
چہرہ میں آفتاب نبوت کا نور تھا + آنکھوں میں شان صولت سرکار بوتراب
لخت دل امام حسین ابن بوتراب + شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب
چہرہ سے شاہزادہ کے اٹھی جبھی نقاب + بس مہر سپہر ہوا خجلت سے آب آب
شہزادۂ جلیل علی اکبر جمیل + بستان حسن میں گل خوش منظر شباب
صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا + چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب
صولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواں + جرائت نے باگ تھامی شجاعت نے لی رکاب
سینوں میں آگ لگ گئی اعدائے دین + غیظ و غضب کے شعلوں سے دل ہو گئے کباب
چمکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا + اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب
مردان کار لرزہ براندام ہو گئے + شیر افگنوں کے حالتیں ہونے لگیں خراب
تلوار تھی کہ صاعقۂ برق بار تھا + یا از برائے رجم شیاطین تھا شہاب
پیاسا کہا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا + اس جود پر ہے آج تری تیغ زہر آب
میداں میں اس کے حسن ہنر دیکھ کر لعیم + حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب

ফাতিমা দৃষ্টির (আলী আকবর) আলো সুদুর ঐ আসমান
খাদিজা পাকের দিলের (আলী আকবর) সবর যেন বেহেশতী উদ্যান।

আকৃতি ছিল নির্বাচিত-দৃঢ়তা তার লা জাওয়াব,
ঘন কালো যুলফ তার, তো চেহরা ছিল আফতাব।

ভরা যৌবন-যুলফের কচিক্ষণ-চেহারার ছিল প্রভাতক্ষণ
খুশবুময় ঘাসের সন্ধ্যাক্ষণে কুরবান হলো-যবে গোলাপের ছিল উষালগণ।

ঘোড়ার পিঠে মানুষ নয় সে, যেন সূর্য্য আরোহী
যবে চেহারা হতে পর্দা উঠালেন এ যুবক হাশেমী।

লাজ-শরমে মরে যায় আখি, এমন চেহারা দেখে
হৃদয়ের হয়েছে থরথর কাঁপুনি দুশমন গিয়েছে ভেগে।

ছিলো হাতে তার-দীর্ঘ দৈর্ঘ্য শানিত তরবারী
নতুবা সে মৃত্যু্যে অজগর-শাস্তি ভয়ংকরী।

দেখিনি কভু এমন যুবক, রব উঠেছে ঐ
তার জাওয়াব হতে পারে এমন কেউ কই?

দু'টুকরো করেছে তলোয়ার-যত পর্বতসম পলোয়ান
তারে আঘাত করতে গিয়ে বাহন হয়েছে ম্লান।

চেহারায় ছিল কিরণ রশ্মি-আলো নবুয়্যাতের
চোখে ছিল ভীতির সঞ্চার আবু তুরাবের।

কলিজার টুকরা তিনি, ইমাম হুসাঈনের
নির্বাচিত শের তিনি আলী খান্দানের।

শাহাযাদার নিকাব উঠে, যবে খুলে চেহারা
লাজে মরে গগন সূর্য্য হয় দিশেহারা

মহান শাহযাদা তিনি-আলী আকবার জামীল
সজীব দৃশ্যে শোভিত কাননে যেন একটি ফুল

কুফা ময়দান হলো সে আজ-নুরেরই ধরা
ফাতিমা যাহরার মাহতাব তিনি, রণক্ষেত্রে আলোকধারা।

মারহাবা কয় শৌর্যবীর্য, আযমাত হুংকারী
বীরত্বে নিলো ক্ষিপ্র বাহন, সাহস তরবারী।

হৃদয় দগ্ধ করেছে ঐ শত্রুদল দ্বীনের
গজবের অনলে অন্তর হয়েছে কাবাব যাদের।

তরবারী চমক পুরুষে করে কাপুরষে রূপান্তর
তার দিকে কে তাকাবে, সে রৌশনিবা আছে কার?

হাক-ডাকে তার ঐ মরদগুলোর হয়েছে ধ্বংস
ক্ষীণ বাঘের মন্দাবস্থা যেন ভীত সন্ত্রস্ত।

তরোয়ার ছিল বিজলী গর্জন, বজ্রেরই দোররা
কিংবা আগুনেরই রজম ছিল ইবলিস সারা।

তৃষ্ণার্ত বলেছে যারা, তাদের করেছেন সিক্ত,
সে বদান্যতায় তরবারী আজো, রয়েছে ক্রোধান্বিত।

দেখে নঈম হুসনে জাওহার ময়দানে ঐ তার
বৃদ্ধ-যুবক হুশ হারালো ঝলকে আভার।

ময়দানে কারবালায় ফাতেমী যুবকগণ ঘোড়ার পৃষ্টে ছিলেন অবলোকিত। সমুজ্জ্বল চেহারার খরশান দীপ্তির সামনে চাঁদনী লজ্জা পাচ্ছিলো। নির্মল চেরাগ যেনো স্বীয় সৌন্দর্য্যের আলোতে এ উপত্যকাকে নযরকাড়া বাগানে পরিণত করেছে। যৌবন কালের রবিগুলো রাঙ্গা চরণে উজাড় হতে চলেছে। সুগন্ধময় গাছের পাপড়ী গুলো মুস্তফা আলাইহি সালামের আকৃতি সাদৃশ্যের আভার আলোতে লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আর হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শানের বয়ান দিচ্ছে। এ চাঁদ মুখখানা যেনো ঐ আসল চমকের (প্রিয় নবীর) স্মরণ করাচ্ছিলো। এ সমূহ দুদর্শা কেবল ঐ সংকীর্ণ হৃদয়ের মানুষের জন্য অবধারিত, যারা নবী বাগানের ফুটন্ত গোলাপের বিপক্ষে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা রাখে। ঐ বদ-দ্বীনদের উপর অজস্র ঘৃণা, যারা হাবীবে খোদার আওলাদদের উপর নির্যাতনের সাদমা পৌছাতে ব্যস্ত থাকে।

আসাদুল্লাহী শে'র ময়দানে আসলেন। দুশমনদের কাতারের দিকে এক নযর দৃষ্টিপাত করলেন। হায়দরী তরবারী যুল-ফিক্কার উচুঁ করলেন আর ধমকের সুরে মুখনিঃসৃত কাব্যে নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন-

اناعلی بن حسین بن علی + نحن اهل البیت اولی بالنبی

আমি আলী ইবনে হুসাঈন ইবনে আলী,
মোরা হই আহলে বাইত নবীর নিকটবর্তী।

যে মুহূর্তে হযরত ইমাম আলী আকবার ভীতি সঞ্চারক এ কাব্য পড়লেন,

কারবালার প্রতিটি রন্ধ্র এবং কুফার প্রত্যেন্ত অঞ্চলে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ইয়াযিদ বাহিনীর হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত ছিল। যারা নবী কাননের ফুল ইমাম আলী আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মিষ্ট কণ্ঠে এ বাক্য শুনার পরও যুদ্ধের ক্ষিপ্রতায় শীথিলতা অবলম্বন করেনি। সংকীর্ন হৃদয়ে আহলে বাইতের পোষিত বিদ্বেষ দূর করতে পারেনি। ভীত সন্ত্রস্ত শত্রুসৈন্য আমর বিন সা'দকে জিজ্ঞস করলো। কে এই সাওয়ার? যার তাজাল্লীতে আমাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাচ্ছে। যার ভয় ও দাপটে বাহাদুরের অন্তর নাড়া দিচ্ছে। তার এক একটি সম্পাদন থেকে শান ও বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। ইবনে সা'দ বলতে লাগলো, ইনি হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান। অবয়ব ও চারিত্রিক দিক থেকে স্বীয় নানাজান হুযুরে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামার সাথে সাদৃশ্য রাখেন। একথা শুনামাত্রই সৈন্যদের মাঝে কিছুটা ইতস্ততা অনুভুত হলো। তাদের অন্তরগুলো নিজেদের উপর নিন্দাবাদ প্রকাশ করলো এ ভেবে যে, মুনিবযাদার মুকাবিলায় আসা এবং মহামান্য মেহমানের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা নিতান্তই নিন্মমনা ও কপট ব্যক্তির কাজ। কিন্তু ইবনে যিয়াদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও ইয়াযিদ ঘোষিত পুরস্কার ও সম্মানের লোভ, ধন-সম্পদের মোহ এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে যে, আহলে বাইতের মর্যাদা এবং নিজের কৃতকর্মের মন্দ পরিনাম জানার পরও হৃদয়ের নিন্দাবাদের পরওয়া না করে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে নাফরমান হবার পথ বেছে নিয়েছে। আলে রাসুলের রক্ত প্রবাহিত করা থেকে এবং উভয় জাহানের লাঞ্চনা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার ধার ধারেনি সেদিন।

শাহযাদায়ে আলী ওক্কার ইমাম আলী আকবার মুকাবিলার জন্য এবার শত্রুদের আহবান করলেন কিন্তু দুশমন কাতার হতে কেউ মুকাবিলার জন্য সাহস দেখালনা। কোন বাহাদুরের কদম আগে বাড়ল না। মনে হচ্ছিলো যেন, বাঘের মুকাবিলায় ঐ ছাগলের পাল নীরব নিস্তব্ধ ঠাঁই দাড়িয়ে রয়েছে।

হযরত আলী আকবার আবারো না'রা (শ্লোগান) দিয়ে বললেন, হে যালিমের দল! যদি তোমরা বনী ফাতেমার রক্তের পিপাসু হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের মধ্যে কে আছে বাহাদুর! তাকে ময়দানে প্রেরণ করো। আলীর বাহুবল যদি দেখতে চাও তবে আমার মুকাবিলা করো। কিন্তু কার এতো সাহস ছিলে যে, ইমামযাদার সামনে আসে? কার হৃদয়ে এতো ক্ষিপ্রতা ছিলো যে, বাঘ শাবকের মুকাবিলা করে? ইমাম আলী আকবর যখন দেখতে পেলেন দুশমনের কেউই তার সামনে আসছেনা এবং এক এক করে মুকাবিলা করবার হিম্মাত হারিয়ে ফেলছে, তখন নিজেই ঘোড়াকে সামনের দিকে অগ্রসর করালেন এবং ক্ষিপ্র গতিতে চালিয়ে নিলেন, বিদ্যুৎ গতিতে শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যেদিকে স্বীয় নিশানা

চালিয়েছেন একে একে ধ্বংস করে দিয়েছেন।.এক একবার হামলায় বেশ কিছু দানবকে লুটিয়ে দিলেন। ডান প্রান্তে গিয়েছেন তো শত্রু সারিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। কখনো শত্রুদের মাঝে চক্কর দিলেন তো শুষ্ক মৌসুমে ঝরে পড়া গাছের পাতার ন্যায় গর্দানগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। চর্তুদিকে আতংকের শোরগোল পড়ে গেলো। পলোয়ানদের হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত লাগলো। বাহাদুরদের হিম্মাত যেনো ভাটা পড়ে গেল। কখনো বর্শার আঘাত কখনো বা শানিত যুল ফিকারের তীব্র বিষাদ। এ যেনো শাহযাদায়ে আহলে বাইতের হামলা নয় বরং আল্লাহ পাকের মহা প্রলংকরী শাস্তি চলছে।

এভাবে খরশান রৌদ্রে যুদ্ধ করতে করতে নবী কাননের ফুল-ইমাম আলী আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তৃষ্ণার তীব্রতা চরম পর্যায়ে। ঠিক তখনই নিজের গতিরোধ করে মাহমান্য আব্বা হুযুর ইমাম আলী মকামের খিদমাতে হাযির হলেন আর আরয করলেন "يااباه العطش" ওহে আব্বাজান পিপাসা আর সইছেনা। আমি খুবই তৃষ্ণার্ত। তিনদিন ধরে পানি যেখানে বন্ধ-না জানি তৃষ্ণার তীব্রতা কেমন ছিলো। একদিকে খরতাপ। অন্যদিকে সে খরতাপে জানবাযি রেখে লোহার তৈরি হাতিয়ার শরীর মুবারকে বহন করে যুদ্ধ করা-এ যেনো সূর্য্যের গরমে জলন্ত আগুনে পরিণত হওয়া। যদি ঐ মুহূর্তে কণ্ঠনালী ভিজাবার মতো কয়েক ফোটা পানি পাওয়া যেতো তবে ফাতেমী এ সিংহটি দুশ্চরিত্রের ঐ কীটগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিতেন। মেহেরবান পিতা জানবায সন্তানের পিপাসা দেখেছেন সত্য, কিন্তু কোথায় সে পানি যা শাহাদাতের কামনায় বিভোর সন্তানকে দেয়া যায়? ইমাম আলী মকাম স্নেহের পরশ বুলিয়ে আলী আকবারের গোলাপ সাদৃশ্য চেহারায় আনওয়ারের ধুলো বালি পরিস্কার করলেন আর স্বীয় জিহবা মুবারক প্রিয় ফরযন্দের মুখে চুবিয়ে ধরেন আর তাতেই দয়াময় বাবার স্নেহের পরশে কিছুটা প্রশান্তি লাভ করলেন। অতঃপর ফাতেমী সিংহ আবারো গর্জে উঠেন ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে হতে আওয়ায দিলেন "هل من مباذر" জান নিয়ে খেলার কেউ আছো কি? তবে সামনে আস।

তারেক ও তার পুত্রদ্বয়ের লাঞ্চনাদায়ক মৃত্যু

আমর বিন সা'দ পলোয়ান বিখ্যাত তারেককে বললো খুবই লজ্জাজনক! আহলে বাইতের একজন মাত্র যুবক ময়দানে! আর তোমরা হাযারো সৈন্য-পূর্ণ শক্তিতে ভরপুর। তিনি তোমাদের থেকে প্রথম থেকেই যোদ্ধা তলব করে চলেছেন অথচ তোমাদের কারো সাহস হচ্ছে না তার মুখোমুখি হবার। শেষ পর্যন্ত কোন সাড়া না পেয়ে ইমাম আলী আকবর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নিজেই শত্রুসেনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং প্রতিটি সারিকে ছত্র-ভঙ্গ করে দেন এবং নামী-দামী বাহাদুরদেরকে লাশের স্তুপে পরিণত করেন। কিন্তু তিনিতো ক্ষুর্ধাত, পিপাসার্ত। প্রখর রৌদ্রে লড়তে লড়তে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আঘাতে জর্জরিত আর পরিশ্রান্ত হয়ে

পড়েন। কিছুক্ষণ পর ফাতেমী এ সিপাহসালার আবারো গর্জে উঠেছেন পুনরায় বাহাদুর তলব করছেন। অথচ তোমাদের তরুতাজা দলের মধ্য কারো পক্ষে তার মুকাবিলা করবার সামর্থ্য নেই। তোমাদের বীরত্বের এমন মিথ্যা দাবীর উপর অভিশম্পাত! যদি ক্ষমতা রাখো তবে ময়দানে মুকাবিলা করে বিজয় হাসিল কর। আমি ওয়াদা দিলাম যদি এমনটা করতে পার তাহলে ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে তোমার জন্য মৌসুলের শাসনকর্তার পদ চেয়ে নেব। তারেক বললো, আমি শংকিত এ বিষয়ে যে, একদিকে ফরযন্দে রাসুল-আলে বাতুল ইমাম আলী আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সনে মুকাবিলা করে মন্দ পরিণামের অধিকারী হব। অন্যদিকে যদি আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারি তবে দুনিয়া যেমন ধ্বংস হবে তার সঙ্গে আমার দ্বীন ও দুনিয়া কোনটিই বাকী থাকবেনা। অর্থ্যাৎ দ্বীন দুনিয়া দুটোই হারাতে হবে। ইবনে সা'দ এবার কসম করে তার প্রতিশ্রুতি আরো পোক্ত করলো। সে বললো, খোদার কসম! যদি তুমি আলী আকবারকে পরাজিত করতে পার অবশ্যই তোমাকে মৌসুলের শাসনকর্তা বানানো হবে। পদলোভী তারেক মৌসুলের হুকুমাতের আশায় রিসালাত কাননের সুবাসিত ফুলের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলো। সামনে পৌছতেই সুউচ্চ খান্দানের শাহাযাদার উপর তলোয়ার উঠালো। শাহাযাদা আলী আকবার তারেকের আঘাত প্রতিহত করে দিয়ে তার বুকে এমন সজোরে তলোয়ার মারলেন যা পিট দিয়ে রে হয়ে যায়। ফলে ঘোড়া থেকে সে নীচে পড়ে যায়। এবার শাহাযাদা আলী স্বীয় ঘোড়াকে তার উপর চালিয়ে দিলেন এবং দেহের সমস্ত হাঁড়চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিলেন। বাহাদুর পিতার এমন নাযুক হালত দেখে তারেকের পুত্র আমর বিন তারেক প্রতিশোধ নেবার নেশায় ইমামযাদার দিকে ক্ষেপে আসে। ঘোড়ার তীব্র গতি নিয়ে ইমাম আলী আকবারের উপর হামলা চালানোর মত ঘৃণ্য কাজে ব্যস্ত হতেই শাহাদার মাত্র একটি আঘাতেই সেও জাহান্নামের পথে চলে যায়। এবার তার ভাই-তারেকের আরেক ছেলে তুলহা বিন তারেক পিতাও ভাইয়ের বদলা রিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে শাহযাদার উপর চড়াও হয়। হযরত আলী আকবার তার পরিহিত জামার কলার ধরে উপরে তোলে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্রই তার দমও বের হয়ে যায়। শাহাযাদার এমন বিস্ময় কান্ড দেখে শত্রু সেনার মাঝে আবারও শোরগোল সৃষ্টি হলো।

মিসরা বিন গালিবের শোচনীয় দশা

ইবনে সা'দ এবার প্রসিদ্ধ বাহাদুর 'মিসরা বিন গালিবকে' শাহযাদার মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। মিসরা শাহযাদার উপর হামলা চালায়। শাহযাদা তার আঘাত প্রতিহত করে স্বীয় তলোয়ার দিয়ে মাথার উপর এমন জোরে আঘাত করলেন, দু'টুকরো হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। বীর বাহাদুরের কঠিন পরিনাম

দেখে ইয়াযিদ বাহিনীর আর কেউ একাকী মুকাবিলা করার সাহস দেখালনা। দুরাচারগুলো এবার কৌশল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলো। মাহকাম বিন নওফল'র নেতৃত্ব হাযারো সৈন্য সম্মিলিতভাবে ইমামযাদার উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। শানিত তরবারী হাতে ইমাম আলী আকবারও তাদের উপর হামলা চালালেন। বজ্রকণ্ঠে ধমক শুনিয়ে সৈন্যদেরকে পুনরায় মধ্যখান পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলেন। এ আক্রমনের ফলে শাহাযাদার হাতে অনেক বদনসীবের ধ্বংস হয়। আবার অনেকে পিছনে পালিয়ে যায়।

এ পর্যায়ে ইমামযাদার তৃষ্ণার তীব্রতা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেছে। কণ্ঠনালী শুকিয়ে দেহ মুবারকের শক্তি ক্ষয়ের দিকে...... ছুটে গেলেন মহামান্য পিতার কাছে। পৌছে আরয করলেন "العطش العطش" পিপাসা! পিপাসা! আব্বাজান তৃষ্ণা আর সইছেনা। ইমাম আলী মকাম ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে চোখের মনি! হাউযে কাউসারের পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা নিবারনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। নানাজান মুস্তফা আলাইহিস সালামের পবিত্র হাত থেকে সে পাত্র তুমি সত্বর পেয়ে যাবে। সে পানির স্বাদ এমন যে, যা না কখনো কল্পনায় আসে- না কোন দিন বর্ণনার অপেক্ষা রাখে! ইমাম আলী মকামের মুখে এ কথা শুনে হযরত আলী আকবারের অন্তর প্রফুল্লতায় ভরে গেলো তিনি পুনরায় ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং আবারও শত্রুসেনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ডান প্রান্ত ও বাম প্রান্তে সমানতালে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ এবার এক একজন নয়, সম্মিলিতভাবে চতুর্দিকে থেকে ইমাম আলী আকবারের উপর আগ্রাসন চালানো আরম্ভ করলো। ইমামযাদাও হামলা অব্যাহত রাখলেন। যে দিকে তরবারী চালিয়েছেন দুশমনে আহলে বাইত ধ্বংস হতে লাগলো। মাটি ও রক্তের মাঝে মিশে যেতে লাগলো। কিন্তু কতক্ষণ? চারপাশ থেকে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত বিরামহীন তীরের জখমে জর্জরিত দেহ মুবারক টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ফাতেমা কাননের রঙ্গিন ফুলটি নিজের রক্তে হয়ে গেলেন স্নানভেজা। একের পর এক তরবারী ও বর্শার অব্যাহত আঘাত ফাতেমী রাজ সাওয়ারর শক্তিকে রোধ করে দেয়। ক্ষীণ ও দুর্বল অবস্থায় কোন মতে পিঠে ভর করে যমীনের উপর তাশরীফ রাখলেন। কারবালার মাটির উপর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে দয়াময় পিতা ইমামে পাকের উদ্দেশ্যে আওয়ায দিলেন-یاابتاه ادرکنی হে আব্বাজান! আমাকে নিয়ে যান। আওয়ায শুনামাত্র ইমাম আলী মকাম ঘোড়া নিয়ে ময়দানে পৌছে গেলেন। ক্ষত-বিক্ষত প্রিয় সন্তানকে ময়দান থেকে উঠিয়ে তাবুতে নিয়ে আসলেন। মাথা মুবারকটি নিজের কোলে রাখলেন। হযরত আলী আকবার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আখি যুগল খোলে ইমামে পাকের মায়াভরা চেহরায়ে আনওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন- جان ما نیازمندان قربان تو باد (অর্থাৎ আমাদের প্রাণ সেতো আপনার তরে কুরবান হতে মুখাপেক্ষি) হে আব্বাজান! আমি দেখতে পাচ্ছি আসমানের দরজা উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

শরবতের পেয়ালা হাতে বেহেশতী হুরগুলো অপেক্ষা করছে। এ কথা বলতেই প্রাণ খানা প্রাণ কবজকারীর হাতে সোপর্দ করে দিলেন- انا لله وانااليه راجعون

আহলে বায়তের ধৈর্য ও সহ্য

আল্লাহু আকবার! ইমাম পাক দেখতে পেলেন, আশার কলিগুলো একে একে শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। বরং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন। গর্বের ধনগুলোকে কুরবান করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোন আপত্তি নেই। বরং মাবুদের দরবারে শুকর আদায় করলেন। প্রকৃত কথা হলো বিপদগ্রস্তের জন্য কি আর বিপদের শেষ আছে? উপবাসের উপর উপবাস! পানির নাম গন্ধও নেই! ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে ইমাম আলী মকামের কলিজার টুকরা আজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ফাতেমার আদরের ধনগুলো আজ নিবিচারে নির্যাতনের শিকার হয়ে যবেহ হয়েছেন। প্রিয়জন, নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্দব, খাদিম প্রত্যেকেই আমিন বলছেন আর একের পর এক দায়িত্ব পূর্ণ করে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। সুনসান নিরবতা বিরাজ করছে আহলে বাইত শিবিরে। যাদের প্রতিটি শব্দ হৃদয়ের আরাম ও প্রশান্তির কারণ ছিলো সে নুরের প্রতিচ্ছবিগুলো মাটি ও রক্তের মাঝে নিথর পড়ে আছে। রযায়ে ইলাহির এমন কঠিন পরীক্ষায় তারা অবর্তীণ হয়েছেন, যা বিশ্বজাহানকে আজো হতবাক করে। কেউ বাদ পড়েনি এ মহা সংকট থেকে। ছোট থেকে বড় প্রত্যেকে বিপদগ্রস্ত ছিলেন সে কালো দিবসে।

ইমাম আলী আসগর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত

ইমাম আলী মকাম হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ছোট সন্তান ছিলেন হযরত আলী আসগর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন কম বয়সী দুধের সন্তান। পিপাসায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন। তীব্র তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন। এদিকে পানির অভাবে মায়ের দুধও শুকিয়ে গেছে। পানির নাগালও পাওয়া যাচ্ছে না। কঠিন এ অবস্থায় হযরত আলী আসগরের শুকনো জিহবা বের হয়ে আসে। অস্থিরতায় হাত পা নড়া চড়া করে আর্তনাদের জানান দিচ্ছিলেন। ছোট্ট এ মা'সুম কষ্ট ও যন্ত্রণার শেষ সীমা সহ্য করে চলেছেন। বারবার মায়ের দিকে দেখছেন আর শুকিয়ে যাওয়া জিহবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করছিলেন। অবুঝ বাচ্চাটি কি জানেন ঐ নৃশংস যালিমরা যে পানি বন্ধ করে দিয়েছে? বাচ্চার এমন উৎকণ্ঠা দেখে মায়ের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হতে চললো। ইমাম আলী আসগর কখনো দয়াময় পিতার দিকে ইঙ্গিত করছেন-কারণ তিনি জানেন যে, প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী বাবাই সরবরাহ করে থাকেন। সে আশায় তিনি ইমামে পাককে ইশারা করছিলেন, যেন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি নিয়ে আসা হয়। ছোট্ট পতুলার এমন যাতনা কোন ভাবেই সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিলনা। অবশেষে আলী আজগরের মা জননী ইমামে পাকের কাছে আরয করলেন, হে ইমাম! আদরের এ সন্তানের আহযারী আমার আর সহ্য হচ্ছেনা। দয়া করে তাকে আপনি কোলে নিন আর যালিমদের কাছে তার আর্তনাদ প্রদর্শন করুন। আমার মনে হচ্ছে তারা অন্তত এ বাচ্চার উপর দয়া করবে। কয়েক ফোটা পানি তাকে পান করতে দিবে। হে ইমাম! এ মাসুম না রাখে যুদ্ধ করবার সামর্থ্য! না রাখে ময়দানে যাবার ক্ষমতা! তাহলে কীসের দুশমনি এ বাচ্চার সাথে? স্ত্রীর এমন আবেদন শুনে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছোট নুরে নযরকে বুকের সাথে আগলে নিয়ে দুশমনদের সামনে পৌছলেন। আর বললেন, হে যালিমগণ! আমার সমস্ত খান্দানতো তোমাদের নির্যাতন-নিস্পেষনের বলী হয়েছে। একে একে সকলেই জান কুরবান করেছে। এরপরও যদি তোমাদের হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জোশের মধ্যে থাকে, তবে তার জন্য আমি অবশিষ্ট আছি। এ দুধের বাচ্চাটিতো না পারবে তোমাদের সাথে লড়তে না পারবে তোমাদের কতল করতে। অন্তত তার আহযারির দিকে একটু দৃষ্টিপাততো করো। কৃপা করবার এতটুকু যদি অবকাশ থাকে তো তার কণ্ঠনালীটি সিক্ত করবার জন্য কয়েক ফোটা পানিতো দাও! ইমামে পাকের এমন আবেদন সংকীর্ণ দিলের ঐ পাষন্ডদের প্রভাবিত করলনা। সামান্য পরিমান দয়া তাদের বক্র হৃদয়গুলোতে এ মাসুমের জন্য উদয় হলোনা। পানির পারির্বতে এক বদনসীব তীর ছুড়ে মারল, যা হযরত আলী আসগর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কোমল কণ্ঠনালী ছেদ করে। মাসুম আসগর মুহুর্তেই ইমামে পাকের কোলে ঢলে পড়েন। খোনে মুহাম্মদীতে রঞ্জিত হলেন নবী বংশের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটিও। কী নির্মমতা! কতোইনা পাশবিক আচরণ! পিতার যে কোল সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ নিরাপদস্থল, সেই কোলে থাকা অবস্থায় তীর বিদু হওয়ার চেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে? ইমামে পাক বিদ্ধ হওয়া তীরটি বের করে আনলেন। ততক্ষনে দুধের শিশু ইমাম আলী আসগর শাহাদাতরে সুধা পান করে নিলেন। পিতার কোলে নুরের পুতলা শুয়ে আছেন, রক্তের স্রোতে স্নান করছেন- এ যেনো পাষন্ডতার নির্মম ইতিহাস রচিত হলো। নবী কাননের কনিষ্ঠ পুত্রটিও কুরবানীর দৃষ্টান্তহীন আদর্শ হয়ে রয়লেন।

তাবুতে অপেক্ষমান স্বজনরা ভেবেছিলেন, কালো হৃদয়ের পশুগুলো অন্তত এ অবুঝ বাচ্চাটিকে পানি দিবে। তার আর্তনাদ শুনে শত্রুদের হৃদয় বিগলিত হবে, কিন্তু নবী বাগানের কলিটিকে নিয়ে যখন ইমাম আলী মকাম ফিরে আসলেন, প্রথম দেখাতেই মায়ের মনে হলো, বোধ হয় দুশমনে আহলে বাইত আসগরের উপর দয়া করেছে- তাকে তৃপ্তিভরে পানি পান করতে দিয়েছে, কারন এখন আর হযরত আলী আসগরের আহযারী আর পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। আর্তনাদ ও অস্থিরতা থেমে গেছে। জিহবা প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেছে। দয়াময় পিতার কাছে পানি পাবার আশায় ইশারা ইঙ্গিতও আর করছেননা। সুনসান নিরবতা দেখে মমতাময়ী মা জিজ্ঞেস করলেন হে ইমাম! কী হলো? বোধহয় পানি পেয়ে আমাদের আসগর ঘুমিয়ে পড়েছে। ইমাম

পাক বললেন হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। সাকীয়ে কাউসার নানাজান আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের হাতে রহমত ও কৃপার শরবত পান করে আমাদের নুরে মুন্রে আলী আসগর তার ভাইদের সাথে মিলিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের এ ছোট বাচ্চাটিকেও কুরবানীতে কবুল করে নিয়েছেন। অতঃপর ইমামে পাক আবারো শুকরিয়া আদায় করলেন الحمد لله على احسانه ونواله (সমুদয় প্রশংসা মহান আল্লাহ করুণা ও দয়ার উপর) সন্তুষ্টি ও সর্মপনের পরীক্ষাস্থলে ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গী-সাথীগন সত্য ও ন্যায়ের এমন স্থিরতা প্রদর্শন করলেন যা কুল-কায়েনাতের ফারিশতাদেরও অবাক করে দেয়। প্রকৃত পক্ষে এ কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর চিরন্তন বাণী انى اعلم مالا تعلمون অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জাননা" এ ঘোষনার রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে।

হযরত ইমাম আলী মকাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত

শাহাদাতকামী আহলে বাইতের প্রত্যেক সদস্য একে একে বিদায় নিলেন এবং ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য স্বীয় সত্তাকে কুরবান করে দিলেন। এখন একাকী লড়বার সময় এসেছে। ইমামে পাক নিতান্তই একা। কেউ নেই তার পাশে অন্য এক কলিজার টুকরা পুত্রধন ইমাম জয়নুল আবিদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অসুস্থতার কারণে চরম দূর্বল। এতদসত্বেও তিনি তাবু থেকে বের হয়ে পড়েন এবং ইমামে পাককে একাকী দেখতে পেয়ে স্বীয় হাতে তরবারী তুলে নিলেন। জান কুরবান করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু অসুস্থতা ও সফরের কষ্টের সাথে ক্ষুধা ও পিপসা, লাগাতার অভুক্ত থাকা এবং পানির অভাবে দুর্বলতার এমন পর্যায়ে পৌছলেন যে, কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তি পর্যন্ত খোঁজে পাচ্ছিলেন না। সব সত্ত্বেও ইমাম জয়নুল আবেদীনের অদম্য ইচ্ছা জেগেছে ময়দানে যাবার। অসুস্থ পুত্রের হার না মানা সাহসিকতা দেখে ইমাম আলী মকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে প্রাণপ্রিয় বেটা! ফিরে আসো! ময়দানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করো না! আমিতো খান্দানের স্বজন, নিকটাত্মীয়, দাস-দাসী সকলকেই আল্লাহর পথে ইতোমধ্যেই উৎসর্গ করে দিয়েছি। আলহামদুল্লিাহ! এতো বড় মুসিবতকে প্রিয় নানাজানের সাদ্বকায় ধৈর্য্যের সাথে সহ্যও করেছি। এবার অধম নিজেই খোদা তায়ালার রাস্তায় হাদিয়া হবার জন্য প্রস্তুত আছি। অতএব আমাকেই যেতে দাও। কারণ তোমার পবিত্র স্বত্বার সাথে আমার সমস্ত কামনা জুড়ে আছে। যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও, তাহলে আহলে বাইতের বাকী সদস্যদেরকে দেশে কে পৌছিয়ে দেবে? ঘরের বিবিদের দেখভাল কে করবে? পিতা ও নানাজানের যে আমানত আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কাকে হস্তান্তর করা হবে? কুরআনুল কারীমের হিফাজত সত্য ও ন্যায়ের হাক্বীকৃতের মহা দায়িত্ব কার উপর সোপর্দ করা হবে?

আমার পুতঃপবিত্র বংশধারা কার মাধ্যমে জারী থাকবে? হুসাঈনী সৈয়্যদযাদাদের সিলসিলাহ কার মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে? এর সব কিছু যে তোমাকে ঘিরে। তোমার সাথেই আমার উক্ত আকাঙ্খাগুলো জুড়ে আছে। অতএব তুমি ফিরে এসো।

হযরত যায়নুল আবেদীন ইমামে পাকের স্থলাভিষিক্ত

হে যায়নুল আবেদীন! তুমিতো খান্দানে রিসালত ও নবুয়্যাতের আখেরী চেরাগ! বিশ্বজাহান তোমার আলোয় আলোকিত হবে। মুস্তফা আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হৃদয় মাতানো সৌন্দর্য তোমার ঐ চেহারা-যা দেখে হাবীবে খোদার নুরের তাজাল্লীর অবলোকন করা হবে। হে কলিজার ধন! ওহে নুরের পুতলা! এ সকল দায়িত্ব তোমারই কাঁধে। আমার পরে তুমিই আমার স্থলাভিষিক্ত। তুমিই হবে আমার জাঁনশীন! কোন ভাবেই তোমাকে ময়দানের যাবার অনুমতি দিতে পারছিনা।

হযরত যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, হে আব্বাজান! আমার ভাইয়েরা তো জান কুরবান করে সৌভাগ্য হাসিল করেই নিয়েছেন। আপনার চোখের সামনেই সাকিয়ে কাউসার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রহমাত বারি ও করুণা ধারায় সিক্ত হয়েছেন। অতএব আমাকেও সে সুযোগ দিন। ইমাম যায়নুল আবেদীন এভাবেই করজোরে আবেদন জানালেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে যাবার অনুমতি মিললোনা। ইমামে পাক তার আবদার গ্রহণ করলেন না। বরং ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে পরবর্তী সকল জিম্মাদারী অর্পন করে দিলেন এবং নিজেই যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

ময়দান অভিমুখে ইমামে পাক

ইমামে পাক মিশরী কুবা পরিধান করলেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পাগড়ী মুবারক স্বীয় মাথায় বেধেঁ নিলেন। হযরত আমীরে হামযাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ ঢালটি পিঠের উপর রাখলেন। হযরত হায়দারে কাররার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চমকদার তরবারীর এ ধারক বাহকের পরিবার (তাবুওয়ালারা) না জানি এ মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি কীভাবে অবলোকন করেছেন? কেমন করে সহ্য করেছেন! ইমাম আলী মকাম ময়দানে যাবার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার উপর আরোহন করা মাত্রই আহলে বাইতের আর্তনাদ ছিলো বাধঁভাঙ্গা পর্যায়ের। কারণ তাদের সর্দার দীর্ঘ সময়ের জন্য পৃথক হতে চলেছেন, মায়ার বাধঁনে পরম স্নেহে লালিত হওয়া মানুষগুলোর মাথার উপর থেকে আজ অভিভাবকত্বের ছায়া উঠে যেতে চলেছে। অনাথী কালো ছায়াগুলো গুরপাক খাচ্ছে আহলে বাইতের নুরী দুলালদের আশ-পাশ ঘিরে। মুহতারামাহ বিবিগনের কাছ থেকে অবসান হতে চলেছে দাম্পত্য জীবনের সুখময় ক্ষণ। ব্যথিত হৃদয় সেতো ইমামে পাকের বিচ্ছেদেঁ মুহ্যমান। নিঃস্ব কাফেলাটি পরম আকাঙ্খা নিয়ে ইমামে পাকের হৃদয় পুলকিত করা চেহারার

দিকে তাকিয়ে আছে। হযরত সাকিনার অশ্রুসিক্ত নয়ন যুগল বুর্যগ পিতার আখেরী দীদার করে চলেছে। এই তো অল্প কিছুক্ষন পরই চিরদিনের জন্য মহা জলওয়া বিদায় নেবে। তাবুবাসীর প্রত্যেকের চেহারা যেনো বিবর্ণ আজ। বিষন্ন ও ভীত স্বন্ত্রস্ত আকৃতিগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। কারো শরীরে ছিলনা কোন সতেজতা। না ছিল কারো মুখে তেজস্বী বাকপটুতা। ঠাঁই দাঁড়িয়ে কেবল নুরানী চোখে অশ্রু বয়েছিলেন। আর নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় খান্দানে মুস্তফার মাথার উপর থেকে সর্বাঙ্গীন ছায়াপ্রদানকারীকে বিদায় দিতে চলেছেন। ইমাম আলী মকাম আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণের ছবক প্রদান করলেন।

অতঃপর মালিকে হাক্বীক্বীর সন্তুষ্টি কামনায় সবর ইখতিয়ার করা ও কৃতজ্ঞ হবার ওসয়িত করলেন। অতঃপর ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। একাকী ছুটলেন। একবারেই একাকী! না ছিলেন কাছিম, না ছিলেন আবু বকর, হযরত ওমর, না ছিলেন হযরত ওসমান- আউন, না ছিলেন হযরত জা'ফর ও হযরত আব্বাস যারা যুদ্ধে যাবার পথে ইমামে পাককে বাঁধা দিবেন এবং নিজেদের প্রাণকে ইমামে পাকের জন্য কুরবান করবেন। হযরত আলী আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও চির নিদ্রায় শায়িত, যিনি ছিলেন শাহাদাতের কামনায় অস্থির। আজ কেউ নেই ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রুখবে কিংবা সাহায্য করবে। তিনি এখন একা এবং একাই লড়তে হবে ঐ দুশমনদের সঙ্গে।

ইমামে পাক তাবু থেকে বের হয়ে ময়দানে পৌছলেন। হক ও সত্যাবাদীতার দীপ্ত রবি যেন শামের জমিনে উদয় হলো। বেঁচে থাকবার চরম আকাঙ্খার মিথ্যে 'বাস্তবতা' ইমামে পাককে আজ গোপন করতে পারবেনা। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার বীর সিপাহসালাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। পার্থিব জগতের ভালোবাসা ও আরাম-আয়েশের অন্ধকার পর্দাগুলো আজ সত্য সূর্য্যের আলোতে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। মিথ্যের আঁধার তার নূরানী কিরণে অস্তিত্ব হারিয়েছে। মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামার আউলাদে পাক খোদার রাস্তায় পরিবার পরিজন বিসর্জন দিয়ে পুরো খান্দানকে কুরবান করে দিয়ে এখন নিজেই জান দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। অজস্র সৈন্য সামন্ত তার সামনে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ইমামে পাকের পবিত্র চেহরায় ঘাবড়ে যাবার নিদর্শন পর্যন্ত খোঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। দুশমনের কাফেলা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পাহাড়ের ন্যায় অথচ ইমামে পাকের চোখে মুখে তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। ইমামে পাক শুরুতেই স্বীয় সত্তা ও বংশের মর্যাদা সম্বলিত কবিতাংশ পাঠ করলেন। যা দ্বারা শামীদেরকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অসন্তুষ্টি এবং যুলুমের শেষ পরিণাম সম্পর্কে শংকিত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ

অতঃপর তিনি জীবনের অন্তিম ভাষণ প্রদান করলেন। ভাষণের প্রারম্ভে হামদু-সানা পাঠ করেন। অতঃপর শত্রুদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে জাতি! ঐ খোদাকে ভয় করো, যিনি সকলের মালিক। প্রাণ সঞ্চার করা আর প্রাণ কবয করা তার কুদরত ও তারই ইখতিয়ার। যদি তোমরা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো এবং আমার নানাজান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে শংকিত হও যে, কিয়ামত দিবসে ইনসাফের মিযান প্রতিষ্ঠা করা হবে। সমূহ আমলের হিসাব নেয়া হবে। আমার মুহতারম মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিচার চাইবেন। হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, যার শাফাআত গুনাগারের জন্য ক্ষমা পাবার মাধ্যম এবং সমূহ মুসলমান যার শাফাআত লাভের আকাঙ্খী, তিনি তোমাদের থেকে আমার ব্যাপারে এবং আমার জন্য প্রাণ কুরবানকারীদেরকে ন্যায় বহির্ভুত হত্যাকান্ডের বদলা তালাশ করবেন। হে ইয়াযিদ বাহিনী! তোমরাতো ইতোমধ্যেই আমার পরিজন-প্রিয়জন, শিশু, সাথী ও দাস-দাসী মিলে সত্তর জনকে শহীদ করে দিয়েছো। এখন আমাকে কতল করার নেশায় উম্মাদ হয়ে আছো। সাবধান হয়ে যাও! সতর্ক হয়ে যাও! মনে রেখ পার্থিব ভোগ বিলাসের স্থায়ীত্ব নেই। যদি তোমরা সালতানাতের লোভে আমায় কষ্ট দিয়ে থাকো, তাহলে আমাকে সুযোগ দাও। আমি আরব বিশ্ব ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্য কোন এক প্রান্তে চলে যাব। যদি আমার এ আবেদন তোমাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে তোমরা বিচ্যুত হইওনা। আমি মহান আল্লাহর হুকুম ও রেযামন্দির উপর ধৈর্য্যধারনকারী ও কৃতজ্ঞ থাকব। "الحمد لله ورضينا بقضاء الله" সমূদয় প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং তার ফয়সালার উপর আমি সন্তুষ্ট। এভাবেই ইমাম আলী মকাম ইয়াযিদ বাহিনীকে শেষবারের মত মহান আল্লাহর অবধারিত গযব ও শাস্তি থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাব্বুল আলামীনের ফায়সালাকে রদ করার সাধ্য কি কারো আছে?

মর্মস্পর্শী ভাষণের প্রভাব

সুলতানে কারবালা ইমাম আলী মকামের হৃদয় গ্রাহী যুবানের উপরোক্ত শব্দগুলো শুনে কুফীদের মধ্যে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারা জানতো যে, জাগতিক পুরস্কারের মোহে পড়ে নবী পরিবারের উপর যে যুলুম অত্যাচার করা হচ্ছে তা সুস্পষ্ট লংগন। তারা এও জানতো যে, বাতিলের সংরক্ষণের জন্য তারা উভয় জাহানের দুর্দশাকে বেছে নিয়েছে। একথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতো যে, নির্যাতিত ইমাম সত্য ও ন্যায়ের পথেই আছেন। তদুপরি কাপুরুষ দুশমনগুলো একে একে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে গিয়ে পরকালের লাঞ্ছনা ও

প্রবঞ্চনার যোগ্য হয়েছে শুধু। এ জন্য অনেকেই ইমাম আলী মকামের ঐ ভাষণে প্রভাবিত হয়েছিলো। আচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষগুলোর অন্তরে ঐ সময় কিছুক্ষনের জন্য টনক নাড়া দিয়েছিল। শরীরে শিহরণ জেগে উঠেছিল এবং তাদের কলবে যেনো আলো উদ্ভাসিত হলো। কিন্তু দুশ্চরিত্র কপট শিমুর ও অন্যান্যদের উপর ঐ বক্তব্য কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি বরং তারা সৈন্যদেরকে প্রভাবিত হতে দেখে ইমামে পাকের উদ্দেশ্যে বলল, আপনি এখানেই থামুন এবং ইবনে যিয়াদের কাছে চলুন, আর ইয়াযিদের বায়আত গ্রহন করুন। কেউ আপনাকে হস্তক্ষেপ করবে না। আপনার সঙ্গে লড়বে না যদি তা না করেন, তবে যুদ্ধ ব্যতিত কোন গন্তব্যর থাকবে না। হযরত ইমামও বায়আত অস্বীকৃতির ফলাফল সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানতেন তদুপরি ঐ বক্তব্যটি ছিলো যুদ্ধ থামাবার সর্বশেষ প্রচেষ্টা মাত্র। যাতে কোন ধরনের আপত্তি আর অবশিষ্ট না থাকে। কোন অভিযোগ যেন ইমাম হুসাঈনের উপর আরোপ না করতে পারে।

অবশেষে ইমামে পাকের যুদ্ধ

সৈয়্যদে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নুরে নযর- খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কলিজার টুকরা ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিব্রতকর অবস্থায় স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীদের বিচ্ছেদে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে খর ময়দানে বিশ হাজার সৈন্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতোমধ্যেই মীমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টা খতম করলেন। স্বীয় মর্যাদা ও নিরপরাধ হবার বিষয়ে দুশমনদেরকে অবহিত করলেন এবং বারবার একথা বললেন যে, আমি যুদ্ধ করার নিয়্যাত নিয়ে এখানে আসিনি। যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। চাইলে এখনো সুযোগ দিতে পার, আমি কুফা হতে ফিরে যাবো। কিন্তু শত্রুদের হৃদয় তার কথায় বিগলিত হলনা বরং তাকে একাকী পেয়ে বিশ হাজারের বিশাল বাহিনী নিলর্জ্জ বাহাদুরীর জোশ দেখানোর চেষ্টায় মত্ত হলো।

ইমাম আলী মকাম যখন বুঝে নিলেন যে, কালো হৃদয়ের অমানুষগুলোর জন্য কোন ওযর আর বাকী নেই এবং অন্যায়ভাবে রক্তক্ষরণ ও নিস্পেষণ থেকে তারা কোন ভাবেই ফিরে আসবেনা। তখন তিনি বললেন, হে যালিমের দল! তোমাদের ইচ্ছা এবার পূর্ণ করতে পারো। আমার সাথে মুকাবিলা করার জন্য যাকে ইচ্ছা প্রেরণ করতে পার। প্রসিদ্ধ ও পরীক্ষিত যোদ্ধা যাকে কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে- দুশমনরা তাকে ইমাম আলী মকামের সাথে লড়বার জন্য পাঠাল। সে নির্লজ্জ ইবনে যাহরার সামনে এসে তরবারীর রণ কৌশল প্রদর্শন করতে লাগল। পিপাসার্ত ইমামকে বর্শা দেখাতে লাগল। দ্বীনে ইসালামের ধারক বাহকের সামনে বীরত্বের ডং উপস্থাপন করতে লাগল। শক্তি-সামর্থ্যে পূর্ণ, সৈন্য সামন্তের আধিক্য। একলা ইমামের উপর যেনো বাহাদুরীর অন্ত নেই। অতঃপর ইমাম আলী মকামের সামনে এসে তরবারী উচু করবে মাত্র হাত উঠালো। হযরত ইমাম এবার আঘাত হানলেন আর তাতেই ঐ বেয়াদবের মাথা দু'টুকরো হয়ে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। তার বেয়াদবীমূলক বাহাদুরী মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। অতঃপর আরেকজন শত্রু সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং ইমামে পাকের মুকাবিলা করে নিজের কারিগরী যাহির করার মাধ্যমে হীনমন্যদের কাছে বাহবাহ নেবার অপচেষ্টা করে। উচুঁ আওয়াযে না'রা লাগিয়ে বলতে থাকে যে, শাম ও ইরাকে আমার স্যালুটভরা বীরত্বের জনশ্রুতি রয়েছে। মিশর ও রোমে আমি সু-প্রসিদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে পলোয়ানরা আমাকে সমীহ করে থাকে। হে হুসাইন! আজ তুমি তীব্রশক্তির চাল দেখতে পাবে। ইবনে সা'দের লোকেরা এ অহংকারীর লাফ-গোযাফ শুনে বেশ খুশি হয়ে গেল। সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে যে, কিভাবে আজ ইমামে পাকের মুকাবিলা করে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় ইমামে পাকের কাতরাবস্থা- তার উপর এ বাহাদুরের হুংকার শুনে তিনি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এটিই সুবর্ণ সুযোগ ইমামের মুকাবিলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে বেগ পেতে হবেনা। নিশ্চয় এ বাহাদুর ইমাম হুসাঈনকে কতল করতে সক্ষম হবে। বেয়াদব লোকটি যখন অবাধ্য ঘোড়া চালিয়ে ইমাম আলী মকামের সামনে আসলো- ইমাম পাক তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে যালিম! আমার সম্পর্কে তোর ধারনা সঠিক নয়। তবে শুনে রাখ! দাপট দেখিয়ে যে ব্যক্তি আমার মুকাবিলা করতে আসে-তো হুশ নিয়েই আসে। তোমার মত এক এক করে অনেকেই এসেছে আর রক্ত পিপাসু তরবারীর আঘাতে সকলেই খতম হয়েছে। হুসাইনকে নিঃস্ব ও কমযোর দেখে সয়ংসম্পূর্ণ নিজ দলের কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করছো? আমার দৃষ্টিতে তোমার কোন হাকীকৃত নেই! শামী যুবক এ কথা শুনে আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এবং কোন উত্তর না দিয়ে সরাসরি ইমামে পাকের উপর তরবারী দ্বারা আঘাত হানে। হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার আঘাত প্রতিহত করে কোমরে নিজের তরবারী দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করলেন, মনে হয়েছিল যেন তরবারি দিয়ে সবজি কেটেছেন। এতদসত্ত্বেও শামবাসীরা মনে মনে ভাবতে লাগল যে, ইমাম হুসাঈন ব্যতিত যুদ্ধ করবার মত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। তিনি আর কতক্ষন ক্ষান্ত না হয়ে পারবেন। একটি সময় তাকে থেমে যেতেই হবে। একদিকে প্রচন্ড পিপাসা, অন্যদিকে রৌদ্রের খরতাপ তাকে দুর্বল করে ছাড়বে। বীরত্বের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের মোক্ষম সময় এটি। যতক্ষণ সম্ভব একজন একজন করে লড়ে যাক। কেউনা কেউ সফল হবেই। এভাবেই নতুন নতুন করে একের পর এক সমরবিদ্যায় পারদর্শী পলোয়ান ইমাম আলী মকামের মুকাবিলায় আসা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সামনে আসতেই মুহুর্তেই এক হাতের আঘাতে বীরত্বগাঁথা কাহিনী তার খতম হয়ে যায়। শানিত তরবারী মারছেন তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাটা পড়ছে। কারো তরবারীতে আঘাত করলেন তো সে

তরবারীটি চাকুতে পরিণত হচ্ছে। কারো বা গায়ে পরিহিত লোহার যুদ্ধ বস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কারো কারো পরিহিত জামা কেটে ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আবার কাউকে তরবারীর আগায় উঠিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করছেন, কারো বুকে তলোয়ার মেরেছেন তো সে তলোয়ারের আগা অপর প্রান্তে গিয়ে ছেদ করছে।

কারবালার ময়াদান যেনো আজ কুফার বীর বাহাদুরদের লাশের বীজ বপন করা হয়েছে। ইমাম আলী মকাম নামি-দামী পলোয়ানদের রক্ত দিয়ে সে ময়দানকে আজ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়ে চলেছেন। চারিপাশে লাশের স্তুপ পড়ে রয়েছে। গর্ব করা হয় এমন বাহাদুরগুলো বিফলে গিয়েছে। শত্রুসেনার মাঝে শোরগোল পড়ে গেছে যে, এভাবে যদি চলতে থাকে তবে হায়দারে কাররারের এ বাঘটি কুফার স্ত্রী ও শিশুদেরকে বিধবা এবং ইয়াতিম করে ছাড়বেন। তার বে-পানাহ তরবারী হতে কোন বাহাদুর আজ প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। অতএব আর সুযোগ দেয়া চলবেনা। এবার চারিদিক থেকে বেষ্টন করে সম্মিলিতভাবে হামলা করো।

পশ্চাদপদ অবলম্বনকারী ধোঁকাবাজগুলো ইমামের মুকাবিলা করতে পরিস্কার ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ঐ পদ্ধতি অনুসরন করলো। সত্য- নিষ্ঠার সমুজ্জল চেরাগের উপর যুলুম নির্যাতনের কালো ঘনঘটা বেজে উঠলো। হাজারো যুবক ইমামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চর্তুদিক থেকে ঘিরে ফেললো। তলোয়ার দিয়ে অবিরাম আঘাত হানতে লাগলো। হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্বের প্রশংসা করতে হয়, রক্ত পিপাসুদের এমন ভীড়ে পর্যন্ত তিনি তার শানিত তরবারির চমক প্রদর্শন করে গেলেন। যেদিকেই স্বীয় ঘোড়াকে অগ্রসর করেছেন- শত্রুসেনাকে কেটে লন্ডভন্ড করে ফেলেছেন। শত্রুগণ আবারো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। অসহায়ত্ব অনুভব করতে লাগলো। তারা ভাবতে লাগলো যে, ইমাম আলী মকামের প্রাণখেকো আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার বুঝি আর কোন পন্থা রইলনা। হাজারো সৈন্যের মাঝে তিনি বেষ্টিত অথচ শত্রু পক্ষের মাথাগুলো এমন ভাবে উবড়ে যাচ্ছে যেনো বসন্তে শুকিয়ে যাওয়া গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। এমন দুরাবস্থা দেখে ইবনে সা'দ ও তার পরামর্শ দাতারা চিন্তায় পড়ে গেলো। একলা ইমামের মুকাবিলায় হাযারো সৈন্যদল যেন কিছুই নয়। ছিঃ ছিঃ কুফীদের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গিয়েছে। এতগুলো কুফী বীর বাহাদুর একজন হেজাযীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারলনা! কত বড় লাঞ্ছনা! বিশ্ব ইতিহাসে আমাদের অপদস্থ হবার এ ঘটনা আহলে কুফাকে সর্বদা অপমানিত করতে থাকবে। এর একটা বিহীত ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্যই উপায় খোঁজে বের করতে হবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে, হাতে হাতে যুদ্ধ করে আমাদের পুরো বাহিনী এ বাঘের মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তাই এ পদ্ধতি বিলুপ্ত করে অন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তা হলো, চারপাশ হতে ইমামের উপর তীরের বর্ষণ চালাতে হবে। আর বিরামহীন বর্ষণে তার দেহ যখন জখমে জর্জরিত হবে তবেই তরবারি দিয়ে আঘাত করতে হবে। অতঃপর তীর বিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যগুলো চতুর্পাশ থেকে ইমামে পাককে ঘিরে ফেলল এবং তৃষ্ণায় কাতর হওয়া নবী দুলালকে বিপদে নিপতিত করে তীরের বর্ষণ শুরু করলো। ইমাম আলী মকামের ঘোড়াটি এতই জখম হলো যে, তা দ্বারা কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঘোড়াটি ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে ফেলছে। নিরুপায়ী ইমামকে অবশেষে নীচে নামতে হলো। চতুর্দিক থেকে তীরের অবিরাম বর্ষণ চলছে। মযলুম ইমামের দেহ মুবারক যেনো তীর নিক্ষেপের নিশানা বনে গিয়েছে। নুরানী শরীর জখমে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছে। আপাদমস্তক হুসাঈন রক্তে রঞ্জিত। নির্লজ্জ সংকীর্ণমনা কুফীগণ মহামান্য মেহমানের সাথে কতইনা বর্বর আচরণ দেখাল।

অতঃপর হঠাৎ একটি তীর ইমামের কপাল মুবারকে এসে বিদ্ধ হলো। এটি সেই কপাল মুবারক-যা ছিলো মুস্তফা আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালামের চুম্বন স্থল। এ কপালতো হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মা'শুকদের হৃদয়ের প্রশান্তি। গোস্তাখ কুফীরা সে পবিত্র কপাল ও সমুজ্জল সরে পাকে তীর বিদ্ধ করার মত স্পর্ধা দেখিয়েছে। বিষধর তীরটির আঘাতে ইমামে পাকের মাথা মুবারকে ঘুরপাকের সৃষ্টি হয়। তিনি ঘোড়া থেকে নীচে নেমে পড়েন। কালো অন্তরের কাপুরুষগুলো মাথা মুবারকে তীরটি রেখে দেয়। ফলে সত্যের ধারক-বাহক ইমাম আলী মকাম রক্ত স্রোতে স্নানভেজা হয়ে গেলেন। পরিশেষে বিশ্বকুল সর্দার হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুরানী দৌহিত্র ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের সুধা পান করে নিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

যালিম বদদ্বীনগুলো ইমাম আলী মকাম, সুলতানে কারবালা হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। ইমামের উপর মুসিবতের ক্রমধারা এখানেই শেষ করেনি বরং ইমানের দুশমনরা এবার মাথা মুবারকটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মনস্থ করে। নদর ইবনে খারশাহ নামক এক যালিম সে নাপাক ইচ্ছা নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেও ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান ও মর্যাদার কথা ভাবতেই তার হাতে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং মুহুর্তেই হাত থেকে তরবারিটি ছিটকে পড়ে যায়। অতঃপর খোলি ইবনে ইয়াযিদ কিংবা শোবাল ইবনে ইয়াযিদ নামক যালিম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে নবী নন্দিনীর আদরের দুলার ইমাম আলী মকামের মস্তক মুবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সত্যের তরে নিবেদিত জানবায হুসাঈন ওয়াদা পূরণ করে দেখালেন। দ্বীন এ হক উপর অটল থেকে স্বীয় খান্দান ও নিজের প্রাণকে খোদার রাস্তায় মান্নত করলেন। পানি সংকটে শুকিয়ে যাওয়া কন্ঠনালী তার কেটে ফেলা হয়েছে। সৈয়্যদুশ শুহাদার রক্তে গুলযারে পরিণত হয়েছে ঐ ময়দানে কারবালা। মস্তক ও দেহকে মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে দিয়ে নানাজান আক্বা আলাইহিস সালামের দ্বীনের হক্কানীয়্যাতের আমলী শাহাদাত দিয়েছেন তিনি। কেবল মাত্র তা মুখের বাণীতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কুফা উদ্যানে সততা ও আমানতদারীতার সাথে জান কুরবান করে দিয়ে চির অমর হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

اعلى الله تعالى مكانه واسكنه بحبحه جنابه وامطرعليه شاييب رحمته ورضوانه

সমগ্র কারবালায় যুলম-নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেছে। নবী কাননের সুবাসিত ফুল ধুলো-বালি মিশ্রীত তীব্র গরম হাওয়ায় সাদক্বাহ হয়ে গেছেন। ভরা দুপুরে শহীদ করে দেয়া হয়েছে তাকে। খাতুনে জান্নাতের আদরের দুলাল, দুজাহানের মহান ঐশ্বর্য আজ পৈশাচিকতার সায়লাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। নবী বংশের বাকী সদস্যদের মাথা থেকে আজ অভিভাবকের ছায়া উঠে গেছে। মহান এই সত্ত্বার প্রস্থানে বাচ্চারা হয়েছে ইয়াতিম। নিস্পাপ রমনীগণ হয়েছে কুলহারা বিধবা। নিপীড়িত সন্তান ও দিশেহারা স্ত্রীগণ হয়েছেন কারারুদ্ধ। ৬১ হিজরী সনের ১০ মুহাররম জুমার দিন ৫৬ বছর ৫ মাস ৫দিন বয়সে হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ অস্থায়ী জগত থেকে চির বিদায় নিলেন আর মহান আল্লাহর ডাকে "লাব্বাইক" বলে সাড়া দিলেন।

মাথা মুবারকের দাফন

পাপিষ্ট ইবনে যিয়াদ ইমামে পাকের নুরানী মস্তকটি কুফার অলী-গলি, হাট-বাজারে নির্লজ্জের মত প্রদর্শন করালো। অতঃপর সমূহ খন্ডিত মস্তক এবং বন্দি হওয়া আহলে বাইতসহ নাপাক শিমুরের নেতৃত্বে একটি দলের মাধ্যমে ইয়াযিদের নিকট দামেশকে পাঠাল। নাপাক ইয়াযিদ মাথা মুবারক ও আহলে বাইত সদস্যদেরকে হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মাদীনা তাইয়্যেবাহ প্রেরণ করে। সেখানেই ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মুবারকটি স্বীয় সম্মানিতা মাতা হযরত খাতুনে জান্নাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা অথবা প্রিয় বড়ভাই হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফন করা হয়।

প্রিয় দৌহিত্রের শাহাদাতে নবীজীর আর্তনাদ

পীড়াদায়ক এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হুযুরে পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে যে কষ্ট পৌছেছে এবং তার হৃদয় মুবারকে যে যাতনার সৃষ্টি হয়েছে তা ছিলো অবর্ণনীয় অকল্পনীয়।

- হযরত ইমাম আহমদ ও ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুমাল্লাহু প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমি দুপুর বেলায় স্বপ্নে হুযুর আক্বা আলাইহিস সালাতু ওয়াস তাসলিমাতের দীদার লাভে ধন্য হই। আমি দেখতে পেলাম চির সুগন্ধময় নবী অঝোরে কান্নাকাটি করছেন আর চেহারা মুবারকে মিশে আছে বিক্ষিপ্ত ধুলো-বালি । হাত মুবারকে দেখলাম রক্তভরা একটি শিশি। নবীজীর এমন হালত দেখে হৃদয় আমার অস্থির হয়ে পড়ে। আমি আরয করলাম, আক্বা! আমার জান আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার এমন অবস্থা কেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করলেন, এ শিশিভরা রক্তগুলো কালিজার টুকরা হুসাঈন ও তাঁর সঙ্গীদের। আমি আজ সকাল থেকেই এগুলো সংগ্রহ করে চলেছি। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ঐদিনটি এবং সময় স্মরণ রেখেছিলাম। পরবর্তীতে যখন এ ব্যাপারে আমার কাছে সংবাদ পৌছল তখন বুঝতে পারলাম ঐ দিনেই ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হয়েছে।

- হযরত হাকেম রাহিমাহুল্লাহু তা'আয়ালা বায়হাকী শরীফে হযরত উম্মে সালমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনিও একইভাবে হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছেন যে, তার মাথা মুবারক ও দাঁড়ি মুবারকে ধুলো-বালি লেগে আছে। আমি আরয করলাম, এ গোলাম আপনার কদমে কুরবান হোক! ইয়া রাসুলাল্লাহ! হালত এমন কেনো? নবীজী ইরশাদ করলেন, এইমাত্র হুসাইনের শাহাদাতস্থল কারবালায় গিয়েছিলাম।

- ইমাম বায়হাকী ও হযরত আবু নুয়াইম- বসরা আযবিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হল, তখন আসমান থেকে রক্ত বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হতে থাকে। এমনকি ভোর বেলায় আমাদের পানির কলসী-বর্তন ইত্যাদি পাত্র রক্তে ভরপুর হয়ে যেত।

- ইমাম বায়হাক্বী ও হযরত আবু নুআইম রাহিমাহুমাল্লাহ যুহরী রাহিমাহুমল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, যে দিন হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দেয়া হয় ঐ দিন বায়তুল মুকাদ্দাসে যে পাথরটি উঠানো হত তার নীচে তাজা রক্ত পাওয়া যেত।

শাহাদাতের শোকে অন্ধকার দুনিয়া

- ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) উম্মে হিব্বান হতে বর্ণনা করেন, ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ফলে দিনের বেলায় অন্ধকারে ছেঁয়ে গিয়েছিলো এবং তিনদিন পর্যন্ত তা বলবৎ ছিলো। যে ব্যক্তি ঐ দিনগুলোতে মুখে জা'ফরান লাগিয়েছে তার মুখ ঝলসে গিয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসে পাথরের নীচে তাজা রক্ত পাওয়া গিয়েছে।

অলৌকিক ঘটনা সম্ভার

◆ ইমাম বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ জামীল ইবনে মুররাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযিদের সৈন্যদল ইমাম আলী মকামের সৈন্যের কাছে একটি উট পেয়েছিলো এবং ইমামের শাহাদাতের দিন তা যবেহ করেছে এবং রান্নাও করেছে। কিন্তু খাবার মুহূর্তে সে উঠের গোশতগুলো "আন্দারাঈন" ফলের মত তিতা হয়ে গেছে। যা খাওয়া অসম্ভব ছিলো।

◆ আবু নুআঈম রাহিমাহুল্লাহ হযরত সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার দাদী সংবাদ দিয়েছে যে, ইমাম আলী মকামের শাহাদাত দিবসে আমি দেখতে পেয়েছি যে كسم (কুছুম) নামের একটি ফুল (যা থেকে আগুন বের হয়) জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং গোশত আগুন হয়ে গেছে।

◆ ইমাম বায়হাক্বী হযরত আলী ইবনে শের থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন- আমি ইমাম হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় যুবতী ছিলাম। আমি দেখেছি, বেশ কিছুদিন আসমান কান্নাকাটি করেছে অর্থাৎ আসমান থেকে রক্তের বর্ষন হয়েছে।

◆ কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় রয়েছে যে, একটানা সাতদিন পর্যন্ত আসমান থেকে রক্ত বর্ষণ হয়েছে। অবিরাম এ বর্ষণের ফলে বিভিন্ন দালান, ঘর বাড়ী ও দেয়াল সমূহ লালবর্ণ ধারণ করেছে। যে সব কাপড় রক্তে রঙ্গীন হয়ে গিয়েছিলো সেসব কাপড়গুলোর লাল রঙ টুকরো টুকরো হবার পরও মুছে যায় নি।

জ্বীন সম্প্রদায়ের আহযারী

◆ হযরত আবু নুআঈম রাহিমাহুল্লাহ হযরত হাবীব ইবনে সাবিত হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জ্বীন জাতিকে ইমাম হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের উপর এভাবে আর্তনাদ করতে শুনেছি

مسح النبى جبينه + فله بريق فى الخدود
ابواه من عليا قريش+ جدّه خير الجدود
চুমেছেন নবী সে ললাটে!
নূর চমকায় তাই চেহারা পাকে।
মা-বাবা তার সুউচ্চ কুরাইশ!
যার নানাজান ভূষিত মর্যাদায় অশেষ।

◆ হযরত আবু নুআঈম রাহিমাহুল্লাহ হযরত হাবীব ইবনে ছাবিত থেকে আরো বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন। আমি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওফাতের পর থেকে আজকে ব্যতিত ইতিপূর্বে কখনো জ্বীন জাতিকে আহযারী করতে শুনিনি। কিন্তু আজকে শুনেছি এবং আমি জানতে পেরেছি, আজ ইমাম হুসাঈনকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর ঘটনার সত্যতা জানার জন্য স্বীয় দাসীকে বাইরে প্রেরণ করি এবং জানতে পারি যে, সত্যিই ইমাম পাক শহীদ হয়ে গেছেন। তার শাহাদাতের উপর এক জ্বীনের আর্তনাদের ভাষা ছিল এরূপ-

الاىَ عين فابتهلى بجهدٍ + ومن يبكى علىٰ الشهداء بعدى
علىٰ رهط تقودهم المنايا + الى متجبِّر فى ملك عهدى
কাঁদিতে থাকো হে আঁখি যুগল! কাঁদো যতো পারো।
কে কাঁদিবে মোর পরে-শহীদের তরে-আসিবে কি কান্না কারো?
দুর থেকে যালিমের কাছে টেনে এনেছে একদল!
নিঃস্ব হালতে মাউত হয়েছে, প্রয়োগে অন্যায় বল।

দেহহীন মস্তক মুবারকে অলৌকিক আওয়াজ

◆ হযরত ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ মিনহাল ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি কিছু লোক যখন ইমাম হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরে পাকটি বর্শার আগায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, সে সময় আমি দামেশকে ছিলাম। মাথা মুবারকের সামনে এক ব্যক্তি তখন সুরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলো। এক পর্যায়ে অত্র আয়াত ان اصحب الكهف والرقيم كانوامن ايتنا عجبا (অর্থাৎ নিশ্চয় আসহাব কাহফ এবং রাক্কীম শহর আমাদের নিদর্শনাদির মধ্যে অন্যতম আশ্চর্যজনক (নিদর্শন) পর্যন্ত পৌছে, তখন মহান আল্লাহ দেহ বিহীন ঐ মাথা মুবারকে বাকশক্তি প্রদান করেন। সুস্পষ্ট আওয়াযে ঐ যুবানে ইরশাদ করেন-
اعجب من اصحاب الكهف قتلى وحملى অর্থাৎ আসহাবে কাহফের ঘটনা থেকেও আমার শাহাদাত ও আমার মস্তক প্রদর্শন করানো অধিক আশ্চর্যজনক।

এ উক্তির প্রকৃত বিশ্লেষণ হলো, আসহাবে কাহাফের উপর যুলুম করেছে কাফিরের দল আর হযরত ইমাম হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মেহমান বানিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে, পানি বন্ধ করে দিয়ে নির্যাতন করেছে স্বীয় নানাজানের উম্মতগণ। এমনকি সে উম্মতেরা ইমামের পরিবার পরিজন, সঙ্গী-সাথীদেরকে ইমামের চোখের সামনেই শহীদ করেছে। অতঃপর খোদ ইমাম হুসাঈনকেও শহীদ করে দিয়েছে। বাকি আহলে বাইতকে করেছে বন্দী। এতেও ক্ষান্ত হয়নি ঐ যালিম গোষ্টি। ইমাম আলী মকামের মাথা মুবারককে শহর থেকে শহরে নিষ্ঠুরতার সাথে প্রদর্শন করিয়েছে। আসহাবে কাহফ বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার পর আবারো কথা বলেছে, যা নিঃসন্দেহে হতবাক হবার বিষয়। কিন্তু দেহ থেকে মাথা মুবারক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও কথা বলা আরো অধিকতর আশ্চার্যের।

অলৌকিক কলম

আবু নুআঈম(রঃ) ইবনে লাহিয়াহ আবু হাম্বল (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমামে শাহাদাতের পর যখন হতভাগা কুফীগণ মাথা মুবারক নিয়ে দামিশকের পথে হাটছিলো। তখন প্রথম মনযিলে একটি স্থানে বসে মদ্যপান করে। ইতবসরে হঠাৎ লোহার তৈরি একটি কলম তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। কলমটি রক্ত দিয়ে নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখছিল -

اترجوا امة قتلت حسينا   +   شفاعة جده يوم الحساب

অর্থাৎ যারা হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেছে তারা কি এ আকাঙ্খা রাখতে পারে যে, ইমামে পাকের নানাজান কাল ময়দানে মাহশরে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন?

খ্রীষ্টান পাদরীর ঈমান গ্রহণ

এটাও বর্ণিত আছে যে, চলার পথে কাফেলাটি আরো একটি মনযিল অতিক্রম করে বিরতি গ্রহণ করল। ঐ এলাকায় একটি গীর্জা ছিলো। গীর্জার পাদরী তাদেরকে আশি হাজার দিরহাম প্রদান করে ইমামে পাকের মাথা মুবারকটি এক রাতের জন্য নিজের কাছে রেখে দেয়। খুবই উত্তমভাবে গোসল দেয়। আতর খুশবো লাগিয়ে তাযীমের সাথে রাতভর যিয়ারত করে। ইমামে পাকের করুণ হালত দেখে অঝোরে কান্নাকাটি করে। রহমতে ইলাহীর যে নুর সমূহ সরে পাকের উপর বর্ষণ হচ্ছে তার অবলোকন করে। পরিশেষে ইমামে পাকের প্রতি অকৃত্রিম সম্মান প্রদর্শন ছিলো তার ইসলাম গ্রহণের ওয়াসিলা। অথাৎ পাদরীটি দেহবিহীন মস্তকের মর্যাদা দেখতে পেয়ে ইসলাম কবুল করে নিলো। ঐ দিকে বদনসীবগুলো পাদরী কর্তৃক প্রাপ্ত দিরহাম গুলো ভাগ বাটোয়ারায় মত্ত হয়ে যখনি থলে খুলল, তারা দেখতে পায় যে থলে ভরা সমস্ত দিরহাম মাটি হয়ে গেছে এবং তার এক পাশে লেখা আছে-

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

অর্থাৎ তোমরা মহান আল্লাহকে জালিমদের আচরণের ব্যাপারে অলস মনে করোনা। অন্য আরেক পাশে লেখা আছে وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون অর্থাৎ যুলুমবাজরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে যে, তাদের গন্তব্য স্থল কী রূপ।

সর্বোপরি ইমাম আলী মকামের শাহাদাতের উপর আসমান যমীনে মাতমের সৃষ্টি হয়েছিল। সমূহ পৃথিবী দুঃখ-যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত ছিলো। শাহাদাতের পুরো দিন জুড়ে সূর্যগ্রহণের কারণে পৃথিবীব্যাপী এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, দ্বি-প্রহরের সময়েও আকাশের তারকাগুলো দৃশ্যমান হতে লাগলো। কে কাঁদেনি সে দিন। কেঁদেছে আসমান- কেঁদেছে যমীন। বাতাসে ভেসে এসেছে জ্বিন জাতির আর্তনাদ ভরা করুণ সুর। সে পাদরী পর্যন্ত কিয়ামতের এ নমুনা দেখে ভয়ে থরথর

করে কেঁপেছিল। আর অঝোরে কান্না করেছিল।

অতঃপর ফরযন্দে রাসুল, গুশায়ে বাতুল, কুরাইশ সরদার হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র মস্তকটি ইবনে যিয়াদ ও বদ নসীবদের সামনে তাশত বা পাত্রে রাখা হয়। আর ঐ দিকে গুস্তাখ ইয়াযিদ অভিশপ্ত ফিরাউনের মত মসনদে আরোহন করে আছে। এমন বেয়াদবীপূর্ণ দৃশ্যে না জানি মর্যাদার উচ্চু শিখরে অভিষিক্ত আহলে বাইতের হৃদয়ের অবস্থা কেমন ছিল? অতঃপর ইমামের নুরানী মস্তক ও অন্যান্য শহীদদের মাথা মুবারক গুলোকে শহরের প্রান্তে প্রান্তে এলাকায় বর্শার আগায় উঠিয়ে প্রদর্শন করা হয় এবং ঐ হালতেই নাপাক ইয়াযিদের সামনে 'সরে পাকগুলো' ফেলে রাখা হয়। হ্যাঁ এতেই জাহান্নামের কীটগুলো খুশি ছিল। কিন্তু কার সহ্য হবে এমন আচরণ? আহলে বাইতের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার কে মেনে নিতে পারবে? এমনকি ইয়াযিদের মেজাজও বিগড়ে গিয়েছিলো। এ দৃশ্য তার সহ্য হয়নি। ফলে এমন বর্বরতার উপর ঐ বদযাত ইয়াযিদ অনুশোচনা প্রকাশ করলো। কিন্তু তার এ অনুশোচনা ছিলো লোক দেখানো। অনুতপ্ত হবার এ নাটক ছিলো স্বীয় জাতিকে আয়ত্বে রাখার কৌশল, ধোকা দেবার চালাকি। নতুবা নাপাক ইয়াযিদের হৃদয় ছিলো আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

হযরত ইমামের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের পাহাড় চাপা দেয়া হয়েছে সে দিন। তিনি ও তার পরিজন ধৈর্য্য ও রেযামন্দির এমন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন, যা গোটা দুনিয়াকে আজও হতবাক করে দেয়। খোদার পথে এতই বিপদ থেকে মহা বিপদ সহ্য করেছেন, যার কল্পনায় হৃদয় থরথর করে কাপঁতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এই মহা পরীক্ষায় নিহীত রয়েছে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থাকবার উন্নত শিক্ষা।

শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাসমূহ

হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অস্তিত্ব বা তাঁর বেঁচে থাকা নাপাক ইয়াযিদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার জন্য বরাবরই হুমকি ছিলো। সে খুব ভালো করে জানতো যে, ইমামের জীবদ্দশায় তার লাগামহীন জীবন যাপনের সুযোগ থাকবেনা এবং ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর ব্যাপারে তিনি সবর ইখতিয়ার করবেন না। তার দৃষ্টিতে ব্যাপারটি আরো পরিস্কার ছিলো যে, ইমাম আলী মকামের মত দ্বীনদার ব্যক্তির রীতিনীতি, নৈতিকতাবোধ তার মাথায় নিয়মিত ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ কারণে সে ইমামে পাকের জানের দুশমনে পরিণত হয়ে উঠে। অতএব ইমামের শাহাদাত নিঃসন্দেহে ইয়াযিদের জন্য আনন্দিত হবার কারণ।

এ জগত থেকে ইমাম আলী মকামের ছায়া উঠে যাওয়া মাত্রই নাপাক ইয়াযিদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। তার আমলে নানান অপরাধে বাজার সয়লাব হয়ে যায়।

ব্যভিচার, সমকামিতা, অবৈধ কাজ, ভাই-বোনে বিয়ে, সুদ, শরাব ইত্যাদি অপরাধের ক্রমান্বয় প্রাধান্য পেতে থাকে। নামাযের পাবন্দী বিলুপ্ত হয়ে যায়। নাফরমানী ও অবাধ্যতা ছিল চরম পর্যায়ে। ইবলিসী শাসনকর্তার লাগামহীনতা শেষতক এমন অবস্থায় পৌছল যে, মুসলিম ইবনে ওকবার নেতৃত্বে বার হাজার মতান্তরে বিশ হাজার সৈন্যের বহরকে মদীনা তাইয়্যেবাহ আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়। এটি হিজরী ৬৩ সনের ঘটনা। পথভ্রষ্ট সৈন্যগুলো মদীনা শরীফে এমন তুলকালাম কান্ড চালিয়েছিল যে, (العظمة لله) (সমূহ মর্যাদা আল্লাহর জন্য) লুটপাট হত্যাসহ নবীজীর সাহাবাদের উপর যা করা হয়েছিল তা ছিল অসহনীয়। মদীনাবাসীদের ঘর-বাড়ী ডাকাতিও লুটপাট করে নিঃস্ব করে দিয়েছে। এই কমবখত গুলো কমপক্ষে সাতশত সাহাবীকে হত্যা করেছে। অন্যান্য সাধারণ মুসলমানসহ দশ হাজারের অধিক হবে তাদের হত্যাযজ্ঞের পরিসংখ্যান। এমন নির্লজ্জ আচরণ করা হয়েছে যার বর্ণনা দেয়া অনুচিত মনে করছি। মসজিদে নববী শরীফের খুটিগুলোর সাথে ঘোড়া বাঁধা হয়েছে। তিনদিন পর্যন্ত লাগাতার মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায়ের সৌভাগ্য হাসিল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পাগলের বেশে মসজিদের অভ্যন্তরে উপস্থিত ছিলেন।

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ ইবনে গাসিল বলেন, ইয়াযিদ বাহিনীর লাগামহীন তান্ডব এতো চরমে পৌছেছিল যে, আমাদের মনে হতে লাগলো এ পাপিষ্ট গুলোর কারণে না কখন আবার আসমান থেকে পাথর বর্ষণ শুরু হয়। অতঃপর তারা মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে তাদের সেনা প্রধানের মৃত্যু হয়। অন্য আরেকজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মক্কা শরীফে পৌছে মিনজিক্ব (পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র যা দ্বারা অনেক দুর থেকে খুবই যবরদস্ত করে পাথর নিক্ষেপ করা যায়) দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে। তীব্র পাথর বর্ষণের ফলে হারম শরীফের বরকতময় আঙ্গিনা পাথরে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। এমনকি মসজিদে হারামের অনেক খুঁটি ভেঙ্গে পড়ে। ঐ বেদ্বীনগুলো শেষ পর্যন্ত কা'বা শরীফের গিলাফ ও শামিয়ানা আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেলে। যে শামিয়ানাতে সংরক্ষিত ছিল বেহেশতী ঐ দুম্বার শিং, যা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ফিদিয়া হিসেবে কুরবানী দেয়া হয়েছিল। সে শিংও পুড়ে গিয়েছে। বেশ ক'দিন গিলাফহীন রাখা হয় কা'বা শরীফকে। সে দিন হারাম শরীফের অধিবাসীদের উপর মুসিবতের সীমারেখা অতিক্রম করা হয়েছে।

নাপাক ইয়াযিদের মৃত্যু

অবশেষে তান্ডবলীলার অবসান। মহান আল্লাহ নাপাক ইয়াযিদকে ধ্বংস করে দিলেন। তিন বছর সাত মাস ব্যাপী তখতে হুকুমাতে বসে ইবলিসী ষড়যন্ত্র আর যুলম নির্যাতন করার পর হিজরী ৬৪ সনের ১৫ রবিউল আউয়াল যে দিন তার নির্দেশে কা'বায়ে মুকাররমাকে লাঞ্ছিত করা হয়, ঐ দিনই শাম দেশের হিমস শহরে উনচল্লিশ বছর বয়সে নাপাক ইয়াযিদ ধ্বংস হয়ে যায়। এখনও তার বাহিনীর বর্বরতা থামেনি। এরই মাঝে তার মৃত্যুর খবর সেখানে পৌছে যায়। তাৎক্ষনিক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিলেন, হে আহলে শাম! তোমাদের তাগুত মরে গিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে তোমাদের ইবলিশী শক্তি। এ আওয়াজ শুনে ইয়াযিদ বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুহুর্তেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

ইবনে যুবাইরের হাতে বায়াত

অবশেষে মক্কাবাসী অপকৃষ্ট যালিম গোষ্ঠির নির্যাতন থেকে মুক্তি পেল। হিজায, ইয়ামান, ইরাক ও খোরাসানের অধিবাসীগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র হাতে বায়াত নেয়।

ইয়াযিদ পুত্রের খেলাফত গ্রহণ

এ দিকে মিশর ও শামের লোকেরা মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদের বায়াত নেয়া শুরু করে ৬৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে। যদিও মুআবিয়া ছিল নাপাক ইয়াযিদের পুত্র। তদুপরি তিনি ছিলেন সৎ ও পূণ্যবান লোক। স্বীয় পিতার কৃতকর্মের উপর তার প্রচন্ড ঘৃনা ছিলো। রাজ্যের শাসনভার নেওয়ার সময় থেকে তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ফলে কোন কাজে মনোনিবেশ করার মত সময় সুযোগ তার হয়ে উঠেনি। অবশেষে মাত্র চল্লিশ দিবস মতান্তরে দুই-তিন মাস শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। জীবনের অন্তিম সময়ে তার কাছে আবেদন রাখা হয়েছিলে যে, আপনি কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে যান। মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, আমি খিলাফতের মাঝে কোন স্বাদ খোজে পাইনি। অতএব কি করে সে তিক্ত পদে অন্যকে নিপতিত করে যাই?

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযিদের পরে মিশর ও শামের লোকেরাও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত নেয়। অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকামের আবির্ভাব হয় এবং শামও মিশর তার দখলে চলে যায়। ৬৫ হিজরীতে তারও ইন্তিকাল হয়। অতঃপর তার স্থলে পুত্র আবদুল মালিক শাসনভার গ্রহণ করে।

ইবনে সা'দের লাঞ্ছনাদায়ক মৃত্যু

খলিফা আবদুল মালিকের আমলে মুখতার ইবনে ওবাইদ ছাক্কাফী নামের এক লোক আমর ইবনে সা'দকে তলব করে। ইবনে সা'দের পুত্র পিতার পরিবর্তে

মুখতার সাকফীর আহবানে হাযির হয়। মুখতার জিজ্ঞেস করে- তোমার বাবা কোথায়? সে বললো, তিনি নিঃসঙ্গতা ইখতিয়ার করেছেন। বর্তমানে ঘর থেকে আর বের হননা। মুখতার বললো। কোথায় সেই রায় প্রদেশের হুকুমাত? যার মোহে পড়ে তোমার পিতা আউলাদে রাসুলের সঙ্গে বেঈমানী করেছে! এখন সবকিছু হাতছাড়া করে নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করার কারণ কী? কেন সে ইমামে আলী মকামের শাহাদাতের দিন ঘরে অবস্থান নেয়নি? আজ কেনো হঠাৎ ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেলো? প্রকৃত পক্ষে এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর ছিলো না পুত্রের কাছে।

মুখতার ছাক্বাফী অবশেষে ইবনে সা'দ, তার পুত্র এবং নাপাক শিমুরকে হত্যা করে। দেহ থেকে তাদের মস্তকগুলো চরম লাঞ্চনার সাথে দ্বিখন্ডিত করে দেয়। খন্ডিত মাথা সমূহ ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাই হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণের সময় নাপাক শিমুরের লাশটি ঘোড়ার খুরের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়। ফলে তার বুক ও হাড্ডিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। শিমুর ঐ ব্যক্তি, যে ইমামে পাকের হত্যাকারীদের অন্যতম। ইবনে সা'দ ছিল সে কাফেলার প্রধান। যে ব্যক্তি ইমাম আলী মকামের উপর নির্যাতনের তুফান চালিয়েছিল। আজ সে যালিমদের লজ্জাজনক অবসান হয়েছে। নাফরমানগুলোর দেহ থেকে মাথা দ্বিখন্ড করা হয়েছে। জঙ্গল থেকে জঙ্গলে তাদেরকে টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এ লাঞ্চনার উপর আফসোস করা হয়নি। এমন বেহাল দশা থেকে দুনিয়াবাসী শুধুই ভর্ৎসনা দিয়ে চলেছে। নিন্দার দৃষ্টিতে দেখছে আহলে বাইতের প্রেমিকরা। এই বলে তারা আনন্দ প্রকাশ করছে যে, এমন মৃত্যুই তাদের প্রাপ্য ছিলো। মুখতার ছাক্বাফীর এমন বীরত্বে প্রত্যেকে সে দিন খুশি হয়েছিল। ইমামে পাকের হত্যার প্রতিশোধ নেয়াতে সকলে তাকে মুবারকবাদ জানাল-

اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی + ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی
اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی + کیسی سزا تجھیا بھی اے ناسزا ملی
اے تشنگان خون جوانان اہل بیت + دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی
کتوں کی طرح لاشے تمہارے سڑا گئے + گھرے جا بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی
رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے + مردود تم کو ذلت رہ دو سرا ملی
تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستاں + تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی
دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں + دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی
آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے + سر کٹ گئے اماں نے تمہیں اک ذرا ملی
پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا + دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی

পেয়েছো কী হায় হুকুমাতে রায় আরে ঐ সা'দ তনয়!
মিলেছে ত্বরা শাস্তি কড়া, যা করেছ যুলুম অন্যায়।
নিকম্মা শিমুর-কী হলোরে তোর, শহীদের রক্তে করিস খেলা!
ওরে বদনসীব-কতো যে পেয়েছিস, সাজা তুই এই বেলা।
আরে ঐ রক্ত পিপাসু, নবী বংশের তোরা খোন খেকো!
দেখ তবে-যুলুমের ভবে, শাস্তি হয়গো ছাড় নাইকো।
তোদেরই লাশ হয়েছে বিনাশ কুকুরের মত গলে
মিলেনি ঠাঁই গোয়াল ঘরে হায়, না মাটির তলে।
লাঞ্চিত-বঞ্চিত সৃষ্টিকুলে, গিয়েছে বরবাদ রসাতলে
আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত তোরা, অপদস্থ দুই কুলে।
করেছিস উজাড় ভেঙ্গে চুরমার কাননে মা ফাতিমা!
নিজেই নিজেদের ধ্বংস করেছিস, এইতো বদদোয়া।
বিমুখ হয়েছিস দ্বীন হতে আরে ঐ জগত পূজারী!
তব পাসনি আয়েশ-মিঠেনি খাহেশ, না পেয়েছিস দুনিয়াদারী।
আখের শহীদের রক্ত দেখিয়েছে রঙ্গের চমক।
কী পেয়েছিস হায়-দুর ছাই! কাটিয়েছিস সমূলে মস্তক।
হে নঈম! পেয়েছে কি আদৌ শাস্তি তারা আযাবে ইলাহী?
তব দেখবে তাদের জাহান্নামে, যবে চলবে গযবে ইলাহী।

অতঃপর মুখতার ছাক্বাফী উন্মুক্ত আদেশ জারী করলো যে, কারবালার ঘটনায় যে বা যারা ইবনে সা'দের সঙ্গে ছিল, তার পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হোক। এ আদেশ শুনে কুফার যালিমগন ভয়ে বসরায় পালাতে শুরু করে। মুখতারের সৈন্যগণ তাদের পিছু নিয়ে যাকে যেখানেই পেয়েছে খতম করে দিয়েছে। জালিয়ে দিয়েছে তাদের লাশগুলো। লুটে নিয়েছে প্রতিটি ঘরবাড়ী। অতঃপর খোলি বিন ইয়াযিদকে গ্রেফতার করা হলো। এ যালিম সে ব্যক্তি, যে ইমাম আলী মকামের দেহ মুবারক থেকে 'সরে পাককে' পৃথক করেছে। ঐ একই নিয়মে ইবনে সা'দের সমস্ত সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে মুখতার ধ্বংস করে দেয়। ছয় হাজার কুফী যারা ইমামে পাকের কতলের সাথে যুক্ত

ছিলো তাদের প্রত্যেককেই নানা রকম সাজা প্রদানের মাধ্যমে মুখতার ছাক্বাফী নিঃশেষ করে দেয়।

ইবনে যিয়াদের করুণ পরিণতি

ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিল ইয়াযিদের পক্ষ থেকে কুফার গভর্ণর। ইমাম আলী মকাম ও আহলে বাইতের উপর যত যুলুম নিস্পেষণ হয়েছে তার সবটুকু ছিল এ লুণ্ঠক-লুব্ধকের নির্দেশের বাস্তবায়ন। নাপাক ইয়াযিদের পা-চাটা গোলাম ইবনে যিয়াদ মুখতারের মুকাবিলায় মৌসুলে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি ফৌজ নিয়ে অবতরণ করে। মুখতার ছাক্বাফী ও ইব্রাহীম ইবনে মালিক আশতারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করে। মৌসুল শহর থেকে পনেরো মাইলের ব্যবধানে ফোরাত নদীর পাড়ে উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎকট এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। দিনের শেষ ভাগে সুর্যাস্ত কালে ইব্রাহীম বাহিনীর বিজয় অর্জন হয়। ফলে ইবনে যিয়াদ দারুন পরাস্ত হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ইব্রাহীমের নির্দেশ ছিলো, শত্রুপক্ষের যাকে হাতের নাগালে পাবে তাকে হত্যা করে ছাড়বে। এ যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে অনেককেই হত্যা করা হয় এবং এ যুদ্ধেই হিজরী ৬৭ সনের ১০ মুহররম ফোরাতের পাড়ে ইবনে যিয়াদ লাঞ্ছনাদায়ক মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। অতঃপর তার কর্তিত মাথাটি ইব্রাহিমের নিকট পাঠানো হলে ইব্রাহিম সে মাথাটি মুখতারের কাছে কুফায় পাঠিয়ে দেয়। এদিকে মুখতার কুফার রাজভবন প্রস্তুত করে সেখানে কুফাবাসীকে সমবেত করলো। ইবনে যিয়াদের অপবিত্র মস্তকটি ঐ স্থানে রাখা হলো, যেখানে ঠিক ছয় বছর পূর্বে দুনিয়া লিপ্সু নাপরমান ইবনে যিয়াদ হযরত ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মুবারক রেখেছিল। অতঃপর মুখতার আহলে কুফার উদ্দেশ্যে দেয়া তার ভাষণে বললো হে কুফাবাসী! দেখো ইমাম হুসাঈনের পবিত্র রক্ত ইবনে যিয়াদকে ছেড়ে দেয়নি । কি বাস্তব পরিণতি! এ লক্ষভ্রষ্টের মাথাটি লাঞ্ছনার সাথে এখানে রাখা হয়েছে। ছয় বছর হলো। সে একই তারিখ! একই স্থান! মহান আল্লাহ এ ফেরাউন আদরাকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থের সাথে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সে একই রাজ দরবারে এ বেদ্বীনের হত্যা ও ধ্বংসের উপর আজ খুশি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

◆ তিরমিযী শরীফের সহীহ হাদীসে বিবৃত আছে, যে দিন ইবনে যিয়াদ ও তার নেতৃস্থানীয়দের মস্তকগুলো মুখতারের সামনে রাখা হয়, সে দিন একটি সাঁপ দৃষ্টিগোচর হয়। যা দেখে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সাঁপটি সবকটি মাথার উপর চক্কর দেওয়ার পর ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে যায় এবং তার নাকের ভিতর প্রবেশ করে। বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর ঐ সাঁপটি মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। এভাবে তিন তিনবার মাথার ভিতর প্রবেশ করে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছাড়া কায়স ইবনে আশআস কিন্দী, খোলি ইবনে ইয়াযিদ, সিনান ইবনে আনাস নাখয়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স, ইয়াযিদ ইবনে মালিক এবং বাকী সকল বদনসীব ইমাম আলী মকামের হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। তাদের লাশগুলোকে ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

◆ হাদীস শরীফে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ইমামে পাকের হত্যার বদলায় সত্তর হাজার বদনসীবকে মেরে ফেলবার ওয়াদা রয়েছে। সে ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। দুনিয়া পুঁজারী, মন্দ হৃদয়ের অধিকারী, অবাধ্য মুনাফিকগুলো আশায় বুক বেঁধেছিল, ইমাম হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের উপর খোদা তা'আলার দুশমনগুলো কামনা করেছিল যে, তাদেরকে বহু পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, ক্ষমতার লোভ দেখানো হয়েছে। এমনকি ইয়াযিদ ও ইবনে যিয়াদ সহ প্রমুখের মস্তিষ্ককে তো ঘুরপাক খেয়েছিল বিশ্ব সালতানাত দখলের। তারা মনে করত যে, শুধুমাত্র ইমামের অস্তিত্বই আমাদের দুনিয়া ভোগের জন্য প্রতিবন্ধক। তিনি না হলে গোটা দুনিয়া ইয়াযিদের করায়ত্বে নিয়ে আসা সহজ হবে। হাজার বছরের জন্যে তাদের হুকুমাতের ঝান্ডা স্থাপন করা যাবে। কিন্তু তাদের জানা ছিলনা যুলুমের পরিণতি আর মহান আল্লাহর গযবের ধ্বংসলীলা কতো দ্রুত এবং আহলে বাইতের উপর পৌছানো কষ্টের অসন্তুষ্টির লেলিহান শিখার প্রভাব কেমন হতে পারে? তারা জানতনা যে শহীদের রক্ত কৌশলে জবাব দিতে পারে! তারা জানতোনা যে, শহীদের রক্ত সালতানাতের বাদশাহী উড়িয়ে দিতে পারে। একজন ব্যক্তি যে কিনা ইমামে পাকের কতলের সাথে জড়িত- ধাপে ধাপে শাস্তি প্রয়োগে তার মৃত্য হবে এবং ঐ একই ফোরাত পাড়-ঐ আশুরার দিন হবে! একই জাতি হবে এবং মুখতারের ঘোড়া তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে! সংখ্যার আধিক্য সেদিন কোন কাজে আসবেনা। একই গোষ্ঠি তাদের ধ্বংসলীলার উপর খুশি উদযাপন করবে কে জানতো এসব? কী আশ্চর্য পরিণাম! কী লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি! যদিও যুদ্ধ মাঠে তাদের সংখ্যাধিক্য ছিলো তদুপরি হিজড়াদের ন্যায় তারা পালিয়ে বেড়াবে। ইঁদুর ও কুকুরের ন্যায় প্রাণ রক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই মারা হবে। পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর নিন্দাজ্ঞাপন করা হবে।

◆ কারণ ইমামে পাকের শাহাদাত ছিলো সত্য-ন্যায় সংরক্ষণের নিমিত্তে। যে পথের সমূহ কষ্ট আখেরী নিঃশ্বাসের ঝলক পর্যন্ত শুধু যোদ্ধা অনুসন্ধান করে যায়। এমনকি কাপুরুষগুলোর সহস্র সৈন্যের ভীড় যখন তাকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে নিয়েছিলো, তখনও তার স্থির কদম ও স্বাধীনচিত্তে এতটুকু নড়বড় হয়নি। তিনি ময়দান থেকে পালিয়ে যাননি। ছেড়ে যাননি সত্য ও ন্যায়ের দামানকে। ফিরে আসেননি স্বীয় দাবী থেকে। বীরত্বের জানবাযির খ্যাতি

> পৃথিবীতে যিন্দা করে গিয়েছেন। হক ও সত্যবাদীতার রক্ষণাবেক্ষন করতে গিয়ে যালিমদেরকে স্মরণ রাখার মতো উচিত শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রমান করেছেন যে, নবুয়াতের ফায়জের আলোতে হক্কানিয়াতের ঝলক তাদের পবিত্র অন্তরাত্মা ও শিরা উপশিরায় এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে, যা তীর, তলোয়ার ও বর্শার হাযারো গভীর যখমও তাদেরকে ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। পরকালের উন্মুক্ত হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য তাদের সত্য আঁখিযুগলের সামনে এতই আলোকিত, জাগতিক জীবনের ভোগ-বিলাসকে মনোনিবেশহীন দৃষ্টিতে ক্ষতি হিসেবে নামঞ্জুর করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আমলে যখন দ্বিতীয়বারের মত হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কয়েদী করা হয়। বন্দী জীবনে লোহার তৈরি ভারী বস্তু তার পবিত্র দেহে ঢালা হয় এবং তার জন্য পাহারাদার রাখা হয়। সে যুহরী ইমাম যায়নুল আবেদীনের এমন করুন হালত দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমিই আপনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাই। হে আলে রাসুল! আপনার উপর এ ভারি বস্তুর দুর্দশা আমার সহ্য হচ্ছেনা। তখন ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার কি ধারণা এ বন্দি দশা আমার উপর বিপদ আর চরম যন্ত্রনাদায়ক? হাক্বীক্বত এই যে, যদি আমি চাই তবে এ ভারী বস্তুর কোনটিই আমার উপর থাকবে না। কিন্তু এর মাঝেই রয়েছে প্রতিদান আর স্মরণ। রয়েছে খোদা তা'আলার প্রশান্তি মূলক যিক্র। এ কথা বলেই তিনি বেড়ী থেকে পা এবং হাত কড়া থেকে হাত বের করে দেখালেন। সুবহানাল্লাহ! এটিই মূলত তার 'ইখতিয়ার' যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাকে কারামাত হিসেবে দান করা হয়েছে এবং ঐ বন্দীদশা হলো তার 'ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টি'। মহান আল্লাহর রেযামন্দির জন্য যিনি স্বীয় অস্তিত্ব আরাম-আয়েশ, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ সব কিছু থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কারো পরওয়া পর্যন্ত করেননি। আল্লাহ পাক তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমৃদ্ধি দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে উপকৃত করুন-করুণাসিক্ত করুন এবং তাদের একনিষ্ঠ কুরবানী সমূহের বারাকাত দ্বারা ইসালামকে সদা-সর্বদা বিজিত ও সাহায্যধন্য রাখুন। আমিন-

صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله وعترته اجمعین

****